কথা কও ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

● প্রথম প্রকাশ

১লা আষাঢ়, ১৩৬৬

● প্রকাশক

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

● মুদ্রক

জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়

পি, এম, বাগচী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৩৮-এ, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

● প্রচ্ছদ

শ্যামল সেন

আড়াই টাকা

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

: এই লেখকের অন্যান্য বই :

অসমতল, হলদে বাড়ী, দীপপুঞ্জ, উল্টোরথ, পতাকা, অক্ষরে অক্ষরে চড়াই উৎরাই, দেহ মন, দুরভাষিণী, শ্রেষ্ঠ গল্প, সঙ্গিনী, গোধূলি, চেনা মহল, কাঠগোলাপ, অসবর্ণা, ধূপকাঠি, মলাটের রঙ, অনুরাগিণী, সহৃদয়া, রূপালী রেখা, দীপান্বিতা, নিরিবিলি, ও পাশের দরজা, একূল ওকূল, বসন্ত পঞ্চম, শুক্লপক্ষ, কন্যাকুমারী, মিশ্ররাগ, উত্তরণ, অনমিতা, পূর্বতনী, রূপসজ্জা, অঙ্গীকার।

বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারে রইলাম শুধু আমরা দুজনে। আমি আর আমার মা। কিন্তু মা যেন আধখানা আছে আধখানা নেই। শুকনো রোগাটে চেহারা। দুটি গাল ভেঙে গেছে, চোখ দুটি কোটরে বসেছে। মাথার পাকা চুল কয়েকগাছি তুলে ফেলতে না ফেলতে আবার পাকল। অথচ মার তখন কীই বা এমন বয়স। সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। তাঁর চেহারা দেখে আমার বড় ভয় হত। বাবা যে রোগে মারা গেছেন নিশ্চয়ই সেই ক্ষয় রোগ মার ভিতরে এসেও বাসা বেঁধেছে। কিন্তু এ আশঙ্কার কথা মুখ ফুটে আমি বলতে পারতাম না। পাছে তা সত্যি হয়ে ফলে যায়। আমি শুধু মাকে আমার দিদিমা সেজে শাসন করতাম, 'আচ্ছা তুমি যে ভালো করে খাওনা দাওনা, শরীরের ওপর অত্যাচার কর, তোমার যদি শক্ত অসুখ বিসুখ কিছু হয়, কী উপায় হবে?'

মা আমার পিঠে হাত রেখে একটু হেসে বলত, 'কী আর হবে। আমার জন্তে ডাক্তার বদ্যিও লাগবে না, ওষুধ পথ্যও লাগবে না। শ্মশানের খরচাটা যদি ঘরে থাকে সেখানে পাঠিয়ে দিস আর তা যদি না থাকে লোকজনকে বলিস তারা যেখানে খুসি ফেলে দিয়ে আসবে।'

আমি বলতাম, 'মা তুমি কী নিষ্ঠুর।'

মা আমাকে তাড়াতাড়ি নিজের কাছে টেনে নিয়ে আসত, 'দূর বোকা, বললাম বলেই কি মরলাম নাকি। তোকে একলা রেখে আমি যে স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবো না রে। উঁহু অত তাড়াতাড়ি আমার মরলে চলবে না। তোর বিয়ে দেব, জামাই আসবে, তোদের ছেলেমেয়ে হবে, তবে তো আমার ছুটি। তার আগে যমরাজা যদি আমার চুল ধরেও টানাটানি করে তবু তো এক পা নড়াতে পারবে না।'

মার সেই স্বপ্নের স্বর্গে আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি তো ছোট নই। দতের উৎরে আঠেরয় পড়েছি। সংসারের রীতিনীতি হালচাল আমি সবই বুঝি। আমাদের চেয়ে কত ভালো ভালো ঘরের মেয়েদের বিয়ে হয় না;

তারা চিরকাল আইবুড়ো পড়ে থাকে—আর আমাদের তো দু'বেলা ভালো করে অন্ন জোটে না। বস্তির ঘরে দশ টাকা ভাড়ায় থাকি সেই ভাড়াও আমার মা সমানে দিয়ে উঠতে পারে না। আমার মত গরীবের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে কোন রাজপুত্র যে বসে নেই তা আমি জানি। কিন্তু আমার জন্যে যদি কেউ বসে না থাকে আমিও কারো জন্যে অপেক্ষা করছিনে। বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে। আমি তখন সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি। পরীক্ষায় ফার্ষ্ট সেকেণ্ড না হলেও পাঁচ সাত জনের মধ্যে থাকি। মনে মনে আমার আশা ম্যাট্রিক পাশ করে আমি কলেজে পড়ব। দু' একটা ট্যুইশন কি আর পাব না? সেই টাকায় খরচ চালাব। যতদূর পড়া যায় বি-এ, এম-এ পাশ করে ভালো চাকরি বাকরি করব। ভদ্র পাড়ায়, ভালো বাড়িতে মাকে নিয়ে গিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখব। তার চেয়ে বেশি কিছু আমি ভাবতে পারতাম না, ভাবতে ইচ্ছেও করত না।

আমি মার পাশে শুয়ে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা জানাতাম, 'আমি বিয়ে করব না মা, পাশ করে চাকরি করব।'

অন্ধকার ঘরে মার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ত, 'তুই যদি ছেলে হতিস লতু তা'হলে কি আর আমার ভাবনা ছিল। কপালে যদি আমার সুখই থাকবে দিলু আমাকে ছেড়ে যাবে কেন? বেঁচে থাকলে এতদিন চাকরি বাকরি করবার বয়সতো তার হতই।'

দিলীপ আমার দাদার নাম। পাঁচ বছর বয়সে সে মারা যায়। তার বয়স এখন আর আমার মনেও নেই। কিন্তু মা তাকে মনে করে রেখেছে। সেই মৃত দাদাকে মাঝে মাঝে আমার হিংসে হত। না হয় ছেলে হয়ে নাই জন্মেছি। না হয় মেয়েই হয়েছি এজন্মে। তাই বলে কি জীবনটা একেবারেই বৃথা যাবে? আমি মাকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম, 'লেখাপড়া শিখলে আজকাল মেয়েরাও ফেলা যায় না মা। তারাও কত ভালো ভালো কাজ করতে পারে।'

মা বলত, 'তুই কাকে কি বোঝাস লতি, সে সব বড়লোকের ঘরে হয়। রাঁধুনীর মেয়ে কোনদিন রাজরাণী হয় না।'

রাঁধুনী কথাটা আমার বুকের ভিতরে গিয়ে খচ করে বেঁধে। আমাদের ক্লাসে আর কোন মেয়ের মাকে রাঁধুনীগিরি করে খেতে হয় না। রীতা, মিনতি, সুমিত্রা ক্লাসের যে সব মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব তারা কেউ উকিলের মেয়ে,

কেউ বা ডাক্তার প্রফেসর কি গভর্ণমেণ্ট-অফিসারের মেয়ে। মা কাকিমা কি বউদিদের দামি শাড়ি গয়নার অহঙ্কার করে, আমি মুখ বুজে বসে থাকি। একদিন আমার কি দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। আমি রীতাদের বলেছিলাম, 'আমার মা সরকার বাড়িতে টিউশনি করে।'

আর যাবে কোথায়! রীতা হেসে উঠে বলল, 'তোর মা কাকে পড়ায় রে সুলতা? সরকারদের ঝি চাকরকে? না কি তাদের রান্নাঘরে হাতাখুন্তি শিল নোড়াকে?' ক্লাসের আর সব মেয়ে, কেউ মুখ টিপে হেসেছিল, কেউ বা গা টেপাটেপি করেছিল। মিনতি বলেছিল, 'জানিসনে বুঝি সুলতার মা এম-এ, বি-টি, পাশ করেছে। আমদের বড়দিদিমণির গদিআঁটা চেয়ারখানা কবে যে কেড়ে নেবে তার ঠিক নেই।'

কথাটা কানে যাওয়ায় আমাদের বাংলার টিচার মিস সেহানবিশ অতিকষ্টে হাসি চেপে ক্লাস শুদ্ধ মেয়েকে ধমক দিয়েছিলেন, 'আ। কি হচ্ছে সব? তোমরা বড় ফাজিল হয়েছ।'

তারপর আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'তুমি মিথ্যে কথা বলতে গেলে কেন সুলতা? এখনকার দিনে যে যেভাবে করে খেতে পারে খাবে। তাতে কোন লজ্জা নেই। করবে না ভিক্ষে আর চুরি জোচ্চুরি। তা ছাড়া আর সবই করা যায়। এখনকার দিনে শ্রমের মর্যাদাকে স্বীকার না করলে সমাজের কল্যাণ নেই।'

শ্রমের মর্যাদা! ও শুধু দিদিমণির মুখের কথা। চাল চলনে আচারে ব্যবহারে চাকর রাঁধুনীকে কি ভদ্রলোকেরা মানুষ বলে মনে করে। অথচ কয়েক বছর আগে আমরাও ভদ্রলোকই ছিলাম। আমার বাবা এই ভারতী বিদ্যাপীঠেই একাউনট্যানটের কাজ করতেন। সেক্রেটারী থেকে টিচাররা সবাই তাঁর ভদ্রতার, স্বভাব চরিত্রের প্রশংসা করতেন। আর বাবা সেই প্রশংসার লোভে রাতদিন স্কুলের জন্যে খাটতেন। কিন্তু কী লাভ হল সেই সুখ্যাতির সার্টিফিকেটে? অসুখ যখন হল চিকিৎসার টাকা জুটলো না। মারা যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের অর্ধাহার অনাহারে দিন কাটতে লাগল। পাকা বাড়ির ভাড়া টানতে না পেরে আমরা বস্তি বাড়িতে নেমে এলাম। এখানেও টিঁকে থাকা দায়। এখানেও বাড়িওয়ালাকে মাস মাস ভাড়া গুণতে হয়। নইলে সে দু কথা শুনিয়ে যায়। এখানেও মাছ তরকারি না জুটুক দুবেলা দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতেই হয়। নইলে পোড়া পেট শোনে না।

বাসায় এসে মাকে বললাম, 'মা তুমি সরকার বাড়িতে আর রাঁধতে যেতে পারবে না।'
মা অবাক হয়ে বলল, 'তাহলে কি করে চলবে, রাঁধুনীগিরি যদি না করি ঝিগিরি করে খেতে হবে। আমার তো আর কোন গুণ যোগ্যতা নেই যে তাই দিয়ে তোকে মানুষ করব।'
মার কথার ধরণ শুনে আমার চোখে জল এল। বললাম, 'মা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চেষ্টা চরিত্র করে দেখি কোন কাজ-কর্ম জোটাতে পারি কিনা। এত বড় শহরে আমার জন্যে কোন কাজই কি আর নেই?'
মা বলল, 'না বাপু, তোমার ও সব কিছু করে দরকার নেই, ভেবেও দরকার নেই। এমনিতেই তুমি যতক্ষণ বাইরে থাকো আমি ভয়ে বাঁচিনে। যা একখানা কপাল করেছি। কখন কি ঘটে তার ঠিক কি। গরিবের ঘরে রূপ বড় বালাই।'

আমি মনে মনে হাসি। মায়ের রোগা শরীর নিয়ে যেমন আমার ভাবনা আমার বাড়ন্ত গড়ন নিয়েও মার তেমনি ভয়। আগে আগে মা আমার আসল বয়সের চেয়ে কখনো দু বছর কখনো তিন বছর কম করে বলত। এখন আর তা বলতে ভরসা পায় না। লোকে মোটেই বিশ্বাস করবেনা সে ভয় আছে। শুধু বাড়ন্ত গড়ন নয় আমার নাক মুখ চোখের প্রশংসাও প্রতিবেশী মেয়েদের মুখে, ক্লাসের মেয়েদের মুখে শুনতে পাই, তারা বলে, 'তোর কি, তুই রূপের জোরেই সব পার হয়ে যাবি।'
তাদের কথায় হিংসার ঝাঁজ থাকে।
আমি জবাব দিই, 'আমি তেমন করে পার হতে চাইনে।'
কিন্তু আমি চাই আর না চাই বস্তিশুদ্ধ লোক আমার দিকে চেয়ে থাকে। শুধু স্কুলে যাতায়াতের সময়ই নয় দোকান বাজারে নানা কাজেই আমার বাইরে যাওয়ার দরকার হয়ে পড়ে। বস্তির বাঁদিকে একটা পানবিড়ির দোকান আছে ডান দিকে লণ্ড্রি। পাড়ার যত আড্ডাবাজ ছেলেরা সেখানে এসে ভীড় করে। কোন কোন দিন শিষের শব্দ শোনা যায়, কখনো বা চুক চুক শব্দ। আমার কান লাল হয়ে ওঠে। অবশ্য তাদের মধ্যে ভালো লোকও আছে। কেউ ধমক দেয় 'এই পটলা ওসব কি হচ্ছে? ইতরামোর আর জায়গা পাওনি? ভদ্দরলোকের মেয়ের সঙ্গে ওকি ব্যবহার?'
আমি কোন দিকে না তাকিয়ে কারোর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা নিজের

কাজে চলে যাই, মনে মনে ভাবি আমি নিজে যদি ভালো হই কার সাধ্য আমার অনিষ্ট করে।

কিন্তু এ ধারণা ভাঙতে আমার দেরি হল না। সংসারে নিজে ভালো থাকাটাই যথেষ্ট নয়। আশে পাশে আর পাঁচজন যদি ভালো না হয়; একজনের ভালোত্ব টিকিয়ে রাখা শক্ত।

ক্লাসের যে সব মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি বন্ধুত্ব সুমিতা নন্দীর সঙ্গে। সুমিতা অবশ্য আমার চেয়ে বয়সেও ছোট, দেখতেও ছোট। আমি গরিবের ঘরের মেয়ে। গাঁয়ের বাড়িতে ছিলাম। পড়াশুনো আরম্ভ করতে আমার অনেক দেরি হয়েছে। কিন্তু সুমিতার তো তা নয়। মায়ের কোল ছাড়তে ওর মাষ্টার রাখা হয়েছে। সুমিতার বাবা নামকরা এডভোকেট। এই পাড়াতেই ওদের নিজেদের গাড়ি বাড়ি আছে। শুধু তাই নয় ওর বাবাই আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী। কিন্তু সুমিতার সঙ্গে আমার ভাব সেক্রেটারীর মেয়ে বলে নয়। ওদের বাড়িতে বড় একটা লাইব্রেরী আছে। সেই লাইব্রেরীর বই ও আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে এনে দেয়। আর আমাকে যোগাতে হয় ডিটেকটিভ বই। অন্য কোন বইয়ের দিকে ওর ঝোঁক নেই। গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে ওর সব চেয়ে বেশি ভালো লাগে, অথচ ওদের বাড়িতে ওসব বই নিষিদ্ধ। প্রথমে আমার এসব লুকোচুরির ব্যাপারে ইচ্ছা ছিল না। ভয়ে আমার বুক কাঁপত। বলতাম, 'তোর বাবা যদি দেখতে পান তা হলে কি রক্ষা রাখবেন?' সুমিতার ভারি দুঃসাহস। সে ঠোঁট উলটে বলত 'বাবা দেখতে পাবেনই না। তা ছাড়া তোর অত ভয় কিসের? তোর নামগন্ধ তো তিনি জানতে পারবেন না।'

সুমিতা আমার উপকারী বন্ধু। শুধু নভেল নাটক দিয়ে নয় পাঠ্য বই নোট বই ওর প্রাইভেট টিউটরের কষে দেওয়া অঙ্ক, লিখে দেওয়া রচনা আর ট্রানস্লেসন দিয়েও ও আমাকে সাহায্য করেছে। তাই আমি ওর কাকুতি মিনতি না শুনে পারতাম না।

আমাদের বস্তির আশে পাশের ঘর থেকে আমি ওর জন্যে ডিটেকটিভ বই সংগ্রহ করতাম। আর ও আমাকে এনে দিত চামড়ার বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, যে সব বই স্কুল লাইব্রেরীতে আমরা কিছুতেই পেতাম না।

সেদিন দেনাপাওনা নামে একখানা বই মোটা ভূ-পরিচয়ের তলায় গোপন করে রেখেছি অঙ্কের টিচার মিসেস তালুকদার হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'লতা, দেখি দেখি, ও বইখানা কি ?'

আমি বইখানা ঢেকে রেখে বললাম, 'কিছু নয় দিদিমণি।' মিসেস তালুকদার আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু নয় কিনা আমি দেখে নিচ্ছি। নিয়ে এসো তো বইখানা। নিয়ে এসো বলছি।'

ক্লাস শুদ্ধ, মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ভয়ে ভয়ে বইখানা নিয়ে মিসেস তালুকদারের টেবিলের ওপর রাখলাম। তিনি গম্ভীরভাবে বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, 'এ কি।' তারপর নিজেই বইখানা বন্ধ করে গম্ভীরভাবে বললেন, 'আচ্ছা এখন থাক। এ বই তুমি পাবে না লতা, এ বইতে আমার দরকার আছে। ক্লাস শেষ হয়ে গেলে তুমি আমার সঙ্গে টিচার্স রুমে দেখা কোরো।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাসে তিনি আমাদের কী পড়ালেন কী অঙ্ক করালেন, কিছুই আমার খেয়াল হল না। আমার বুকের মধ্যে শুধু কাঁপতে লাগল। ঘণ্টার শেষে কী হবে কে জানে। যদি ফাইন টাইন করে বসেন তা আমি কোত্থেকে জোগাব। মাকে এসব কথা বলব কী করে। আর বললেই বা সে তা কোত্থেকে দেবে ?

যেটুকু বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম, আসল বিপদ তার চতুর্গুণ হয়ে এল। ক্লাস শেষ হওয়ার পর আমার ডাক পড়ল হেড মিস্ট্রেসের ঘরে। সেখানে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড মিস্ট্রেস মিসেস তালুকদারও ছিলেন।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'লতা এ বই তুমি কোত্থেকে পেয়েছ ?'

বইতে সেক্রেটারীর নাম লেখা ছিল। তবু আমি সুমিতার কথা প্রথমে বললাম না।

হেডমিস্ট্রেস ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করে থাকলে হবে না। আমার কথার জবাব দাও।'

মিসেস তালুকদার বললেন, 'সত্যি কথা যদি বল কোন ভয় নেই তোমার। কিন্তু মিথ্যে বললে কিছুতেই রেহাই পাবে না।'

আমি মৃদু অস্ফুটস্বরে বললাম, 'সুমিতা এনে দিয়েছে। কিন্তু আমিই তাকে আনতে বলেছিলাম।'

বন্ধুকে ধরিয়ে দিতে আমার ভারি কষ্ট হল। কিন্তু না বলেই বা তখন উপায় কি।

হেড মিষ্ট্রেস বললেন, 'হুঁ। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে বড়, সবচেয়ে ধাড়ী মেয়ে তুমি। নিজে তো বখেই গেছ বাকিগুলিকেও বখাবার চেষ্টায় আছ।'
আমি কোন প্রতিবাদ না করে চুপ করে রইলাম।
তারপর হেডমিষ্ট্রেস পেনসিলে লেখা একটুকরো কাগজ তুলে ধরে বললেন; 'আর এটা? এটা কি?'
চমকে উঠে বললাম 'তাতো আমি জানিনে।'
হেডমিষ্ট্রেস ধমক দিয়ে বললেন, 'ন্যাকা মেয়ে। কিছুই জানে না। এ চিঠি তোমার বইয়ের ভিতরেই পাওয়া গেছে।'
আমি বললাম, 'কক্ষনো না।'
হেডমিষ্ট্রেস বললেন, 'বদমাস মেয়ে। তুমি কি বলতে চাও এ চিঠি তোমার বইয়ের মধ্যে আমরা গুঁজে রেখে দিয়েছি? এ যে তোমাকেই লেখা তাতে কোন সন্দেহ নেই। পড়ে দেখ।'
পড়ে দেখলাম। আমার নামেই দু লাইনের চিঠি। 'লতা, তোমাকে বড় ভালোবাসি। তোমার ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারি তুমিও আমাকে চাও। তাহলে এত বাধা আর ব্যবধান কেন। চলনা আমরা চলে যাই। পৃথিবীতে তো জায়গার অভাব নেই।'
হেডমিষ্ট্রেস বললেন, 'এ লেখা কার?'
আমি বললাম, 'আমি জানিনে।'
মিসেস তালুকদার বললেন, 'সত্যি কথা বল লতা। সত্যি বললে কোন ভয় নেই।'
আমি বললাম, 'আমি কি করে বলব। কার লেখা আমি কিছুই জানিনে।'
হেডমিষ্ট্রেস বললেন, 'জানো কি না জানো আমি বের করছি। কার কার সঙ্গে তোমার চিঠিপত্র লেখালেখি আছে?'
আমি বললাম, 'কারো সঙ্গেই না।'
হেডমিষ্ট্রেস ধমক দিয়ে বললেন, 'তবু স্বীকার করবে না? স্বীকার করলে শাস্তির মাত্রা কম হবে। আর অস্বীকার করলে তুমি যে কী শাস্তি পাবে তা তুমি ভাবতেই পার না।'
আমি বললাম, 'কার লেখা আমি জানিনে।'
হেডমিষ্ট্রেস বললেন, 'ছি-ছি-ছি। তোমার বাবা নন্দবাবু কত ভালো লোক ছিলেন। আর তুমি তাঁর মেয়ে হয়ে কিনা,—গরিবের মেয়ে বলে তোমাকে

আমরা বিনা মাইনের পড়তে দিয়েছি, বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছি—আর তুমি কিনা নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলে।'

আমি জেদী মেয়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ যদি আমার নামে মিথ্যে চিঠিপত্র লেখে আমি তার জন্যে কেন দায়ী হব? আর আমি না জেনে কারো নামই বা বলতে যাব কেন? তখন সত্যের ওপর আমার ওই রকম নিষ্ঠাই ছিল। বিশ্বাস ছিল যে দোষ করেনি তার কখনও সাজা হয় না। সংসারে সব সময় পুণ্যের জয় হয়।

হেডমিষ্ট্রেস গম্ভীরভাবে তাঁর সহকারিণীকে বললেন, 'কি adament দেখেছ? ভাঙবে তবু মচকাবে না।' তারপর আমার দিকে দেখে বললেন, 'আচ্ছা, যাও এখন ক্লাসে যাও।'

গুরুতর ঘটনা। সেক্রেটারীর কানে দিতেই হল। দিন কয়েক তাঁর সঙ্গে হেডমিষ্ট্রেসের কী সব পরামর্শ চলল।

তারপর হেডমিষ্ট্রেস আমাকে ডেকে বললেন, 'তোমাকে ট্রানস্ফার সার্টিফিকেট দিচ্ছি। তুমি অন্য স্কুলে ভর্তি হও। এখানে তোমাকে রাখতে পারব না।'

আমি এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম, 'কিন্তু আমার তো কোন দোষ নেই। আমি সত্যিই কিছু জানিনে।'

হেডমিষ্ট্রেস বললেন, 'তোমার জন্যে আমি দুঃখিত লতা। কিন্তু স্কুলের শুচিতা, সুনাম আমাকে বজায় রাখতে হবে। যদি আর কোন স্কুলে ভর্তি হতে না পার, বাড়িতে পড়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দাও। আমাদের সাধ্যমত তোমাকে আমরা সাহায্য করব।'

Good Conduct এর সার্টিফিকেট হেডমিষ্ট্রেস আমাকে দিলেন। মুখে যাই বলুন, মনে যাই ভাবুন কলমের ডগায় তাঁর সহানুভূতি ফুটে উঠল। কিন্তু আমি বাড়িতে এসে টুকরো টুকরো করে সেই সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেললাম। কী হবে ওই মিথ্যে সার্টিফিকেট? আমার কাছে ও কাগজের কোন দাম নেই।

মার কাছে আমি কিছুই লুকোলাম না। সমস্ত অন্যায় অবিচারের কথা আমি তাঁকে খুলে বললাম। প্রথমে সে আমার কথা বিশ্বাস করলে না ভাবল আমিও সমান দোষে দোষী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'সব আমার কপাল।'

তারপর হঠাৎ ক্রোধে ফুঁসে উঠল মা। বলল, 'আমি যাব সেই সেক্রেটারীর

কাছে, যাব হেডমিস্ট্রেসের কাছে। উড়ো চিঠির জন্মে তোকে কেন তারা শাস্তি দেবে। মাথার ওপর কেউ নেই বলে বুঝি আমাদের ওপর এই অবিচার? আর কেউ না থাকুক মাথার ওপর ভগবান তো আছে?'
কিন্তু মার বীরত্ব আমার সামনেই শুধু প্রকাশ পেল। পরে ভেবে চিন্তে বিষয়টা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি না করাই সে সমীচীন মনে করল। আমাদের চেয়ে সবাই ধনী, সবাই ক্ষমতাশালী। কারো সঙ্গে লড়তে যাওয়ার মত আমাদের সহায় সম্পদ কই। ফলে আমার স্কুলে যাওয়া চিরকালের মত বন্ধ হল। মা পাড়াপড়শী সবাইকে বলল টাকার অভাবে সে আমাকে পড়াতে পারল না। আমিও যাতে সেই কথা বলি তাই আমাকে শিখিয়ে দিল। কথাটা অবিশ্বাস্য নয়, তবু অসত্য।

স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে আমি ঘরে বন্দিনী হয়ে রইলাম। স্কুল যে আমার কাছে কী ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার আগে এমন করে বুঝতে পারিনি। স্কুলে যাওয়ার সময় আমি একটু সেজেগুজেই যেতাম। সবাই তাই যায়। তখন সাজবার মত কীই বা আমার ছিল। বাইরে বেরোবার যোগ্য একখানা মাত্র তাঁতের শাড়ি ছাড়া আমার কিছু ছিল না। তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরতাম। প্লাস্টিকের ডুগাছা লাল চুড়ি ছিল আমার একমাত্র গয়না। কিন্তু সবচেয়ে বড় গয়না ছিল আয়না। তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি খুসি হয়ে উঠতাম। সেই আয়না আমাকে বলত আমার ক্লাসের মেয়েরা যত সাজসজ্জাই করুক, যত শাড়ি গয়না পরেই আসুক রূপের প্রতিযোগিতায় তারা আমাকে হারাতে পারবেনা। শুধু বেরোবার আনন্দই নয় বেরিয়ে যেখানে গিয়ে ঢুকব সেই স্কুল ছিল আমার কাছে এক ভিন্ন পৃথিবী, চারদিকে রেলিং ঘেরা দাওয়া, পাকা বাড়ি। সামনে পেছনে খেলার যায়গা, আর তার ভিতরে যারা আসে যায় তারা সবাই শিক্ষিত সভ্য ভদ্রলোক। দলে দলে মেয়েরা ঢুকত যেন রঙীন পাখি আর প্রজাপতি। তাদের মনে কোন ভাবনা নেই। চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আমাদের বস্তি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে পাঁচ মিনিট হাঁটবার পর সেই স্বপ্নের জগৎ। আমাদের বস্তির মত সেখানে ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, দিন রাত্রে ঘরে ঘরে ঝগড়া-ঝাটি হৈচৈ নেই। শান্ত সুন্দর পবিত্র পরিবেশ। সেখানে অভাব অনটনের কথা কেউ তোলে না, চাল ডাল তেল নুনের হিসাব ভুলে যায়। সেখানে ইতিহাসের ঘণ্টায় কোথায় সেই

অশোকের যুগ, ভূগোলের ঘণ্টায় কোথায় সেই আফ্রিকার অরণ্য। এমন দেশ নেই যেখানে তুমি যেতে পারনা এমন কাল নেই যেখানে তোমার প্রবেশে বাধা আছে।

এমন যে স্বর্গের মত স্কুল সেই স্কুল থেকে আমি চিরকালের মত নির্বাসিত হলাম। বিনা দোষে, মিথ্যা কলঙ্কে লাঞ্ছিত হলাম আমি। মা তার কাজে বেরিয়ে গেলে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদলাম। প্রাইজের সময় যত গল্পের বই আর কবিতার বই পেয়েছিলাম রাগ করে ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেললাম। বিতৃষ্ণায় আর আক্রোশে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম রচনার খাতা। সে খাতা যেন খাতা নয়। আমার শত্রুর দল।

ঘরের মধ্যে চুপ চাপ বসে থাকি। পড়তে মন লাগে না, কোন কাজ করতে মন লাগে না। বেরোব যে এমন কোন জায়গাও নেই। থাকবার মধ্যে এপাড়ার আমাদের ক্লাসের কয়েকটি মেয়ের সঙ্গেই জানা শোনা ছিল। তাদের কারো কারোর সঙ্গে রাস্তায় দেখাও হয়। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনা। পাছে তাদের দুর্নাম হয়। আমি মার্কা মারা খারাপ মেয়ে। সুমিতাও আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে।

সরকার-বাড়ি আমাদের পাড়ার মধ্যেই। মা খুব ভোর বেলায় বেরোয় আর রাত দশটায় ফেরে। মাঝখানে দুপুরেও একবার আসে। আমি ঘরে আছি কিনা দেখবার জন্যে। আমাদের পাশের ঘরে থাকে শ্যামলাল দাস। লম্বা জোয়ান চেহারা। তার বউ যমুনা যেমন ছোট খাট তেমনি রোগা। গুটি তিনেক ছেলে মেয়ে নিয়ে তারও মাসের মধ্যে পনের দিন প্রায় অনাহারে কাটে। শ্যামলালের নির্দিষ্ট কোন কাজ নেই যখন যা পায় করে, যখন কিছু পায় না ধারের নামে ভিক্ষে করে। চাল হোক ডাল হোক দু আনা চার আনার পয়সা হোক যা চেয়ে নেয় তা আর ওরা ফেরৎ দেয়না। আমাদের যে কিছু নেই তবু আমাদের কাছেও ওরা অনেক ধারে। শ্যামলাল যখন ঘরে থাকে, বসে বসে রাজা উজীর মারে। আর নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্যের জল্পনা কল্পনা করে। আমি বয়সে ওর অনেক ছোট। তবু আমাকে দিদি বলে ডাকে। শ্যামলাল বলে, 'লতাদি, আমি তোমাকে কাগজ এনে দেব। তোমরা দুই ননদ ভাজে বসে ঠোঙা তৈরি কর। আমিই বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করব। যা লাভ থাকবে তোমার অর্ধেক আমার অর্ধেক!'

আমি বলি, 'বেশ তো শ্যামদা, পুরোন খবরের কাগজ এনে দাও।'

কিন্তু দু-দিন বাদে ফের তার মত পালটে যায়। বলে 'না লতাদি, ঠোঙা-কোঙা করে কিছু হবে না। এসো আমরা একটা সেলাইয়ের কল কিনি। কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিলেই হবে। তুমি আর তোমার বউদি সার্ট পাঞ্জাবী, সায়া-সেমিজ তৈরি করবে। আর আমি কাঁধে করে সেগুলি বিক্রি করে আসব। লাভ যা থাকবে তোমার অর্ধেক আমার অর্ধেক।'
আমি হেসে বলি 'বেশ তো।'
কিন্তু পরদিনই হয়তো মাছের ব্যবসা কি তরকারির ব্যবসার কথা তোলে শ্যামলাল।
আমি হেসে বলি শ্যামদাকে, 'ও তো তোমার একেবারেই বাইরের ব্যবসা। আমরা ননদ ভাজ তো তোমাকে এ ব্যাপারে কিছুই সাহায্য করতে পারব না।'
শ্যামলাল বলে, 'কেন তুমি হিসেব রাখবে। জমা খরচের খাতা দেখবে।'
ওর বউ যমুনা খুন্তি নিয়ে তাড়া করে, 'ছাই দেখবে কচু দেখবে। বেরোও, বেরোও বলছি বাড়ি থেকে। আধ পয়সার কাজের নাম নেই, যত সব গাঁজাখুরি গল্প।'
অত বড় জোয়ানমদ্দ পুরুষ। তার তুলনায় যমুনা তো একটা টুনটুনি পাখি। তবু সেই পাখিকে বাঘের মত ভয় করে শ্যামলাল। তাড়া খেয়ে পালাবার পথ পায় না।

এই যমুনা বউদিকে আমার পাহারায় রেখে যায় আমার মা। পাছে আমি কোথাও বেরোই, পাছে পাড়ার আর কোন দুষ্টু-ছেলে এসে আমাকে বিরক্ত করে। আমি মনে মনে হাসি। মা তো আমার মনের সব খবর জানে না। ভিতরে আমি শক্ত পাহারা বসিয়েছি। বাইরের পাহারায় আমার আর কোন দরকারই নেই।
শ্যামলালের পাড়ায় খুব সুনাম নেই। কেউ বলে চোর, কেউ বলে গুণ্ডা। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত কোন খারাপ কাজ করতে শ্যামলালকে দেখিনি। আমার মনে হয় শ্যামলাল আসলে চোর নয়, ছ্যাঁচোর। ভালো কোন কাজকর্ম যদি পায় ওর ওসব বদ-অভ্যাস যাবে। কিন্তু ততদিনে কাজ করবার অভ্যাস বজায় থাকলে হয়।
আমার পড়া বন্ধ হওয়ার কারণ শ্যামলালের কাছে গোপন রইল না।
সে বলল, 'দুনিয়ার কে যে কত ধর্মপুত্তুর আমার জানতে কিছু বাকি নেই। কে লিখল চিঠি আর কার হল শাস্তি। তুমি আসবে দিদি আমার সঙ্গে?

এখানকার কর্পোরেশনের কাউনসিলরের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে? ভোটের সময় খুব খেটেছিলাম। তিনিও তো স্কুল কমিটির মেম্বার। চল তাকে গিয়ে আমরা ধরি।'

কিন্তু তাতে আমি রাজি হলাম না। এই কেলেঙ্কারির ব্যাপার নিয়ে দরবার করে আরো কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে কি হবে। কেউ কি বিশ্বাস করবে আমার কথা? গরিব বামুনের মেয়ে যার মা পরের বাড়িতে রাঁধুনীগিরি করে খায় সেই আমার মত মেয়েকে কাউন্সিলার হয়তো বাড়িতে ঢুকতেই দেবেন না।

শ্যামদা বলল, 'আচ্ছা তাহলে থাক। দরকার নেই অমন একটা বাজে স্কুলে গিয়ে। সামনের বছর তোমাকে আরো বড় স্কুলে ভর্তি করে দেব, সেই ভালো।'

শ্যামদা আমার গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল অভিভাবক। নিজের আধাপয়সার শক্তি নেই, কিন্তু ভাবখানা যেন এই গোটা কলকাতা শহরটা তার মুঠোর মধ্যে।

কিন্তু পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার চেয়েও আরো বড় দুঃখের কারণ ঘটল। আরো বড় রকমের বিপদ রাক্ষসের মত হাঁ করে গিলতে এলো আমাকে।

সরকার বাড়ি থেকে মার চাকরি গেল। তাঁদের উনানে আঁচ দিতে গিয়ে মা সেদিন কাসতে কাসতে নাকি বসে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বড় গিন্নী ছুটে এলেন 'কি হল লতার মা, কি হল?'

মা সামলে নিয়ে বলল, 'কিছুই হয়নি বড় মা।'

বড় গিন্নী, বললেন, 'দেখ, আমার কপালের নিচে দুটো চোখ আছে। আমি সবই দেখতে পাচ্ছি। তোমার কাসির মধ্যে লাল লাল ওগুলো কী সব।'

মা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'কিচ্ছু না। ও আপনাদের মনের ভুল। আমার সে সব কিছু হয়নি। ঠাণ্ডা লেগে সর্দিকাসি হয়েছে। দু দিনেই সেরে যাবে। তেমন কিছু হলে আমি কি কাজ করতে আসি? নাকি দিনরাত এত কাজ করতে পারি? আমার কি আক্কেল বুদ্ধি বলে কিছু নেই?'

বড়গিন্নী বললেন, 'আক্কেল বুদ্ধির কথা আর বল না। তা তোমাদের কিছু কমই আছে। তোমার অভাব অনটন সে কথা বুঝব না কেন খুবই বুঝি। কিন্তু বাড়িশুদ্ধ লোকের জানপ্রাণ তোমার হাতে, সে কথাও তো তোমার বোঝা দরকার।'

বড়কর্তা এসব ঘরকন্নার ব্যাপারে বড় একটা থাকেন না। টাণ্ড রোডে

লোহার ব্যবসা আছে তাঁদের। সেই সব ব্যবসাপত্র নিয়েই তিনি দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। বাড়ির মধ্যে চেঁচামেচি শুনে তিনি ভিতরে এলেন। তারপর মার দিকে তাকিয়ে তিনি খানিকটা সহানুভূতির সুরে বললেন, 'তুমি বরং কিছু দিন ছুটি নাও লতার মা। ছুটির মাসের মাইনে আমি তোমাকে দেব। শরীর-টরির সারলে তুমি ফের এসে কাজ করো।'

কিন্তু মা বুঝে এসেছে আর তাকে সে বাড়িতে কাজে যেতে হবে না। সুস্থ হলেও বড়গিন্নী ফের তাকে আর কাজে নেবেন না। তাঁর এমন লোকের দরকার যে রাত্রেও সেখানে থাকতে পারে। তাঁর ছেলেরা দেওররা কেউ কম রাত্রে ফেরে না। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে তাঁদের বাড়িতে রাত একটা-দেড়টা হয়। কাজের লোক তার আগেই চলে গেলে তাঁদের চলে কি করে। কিন্তু মা তার সোমত্ত মেয়ে ফেলে পরের বাড়ির রান্নাঘর কি করে সারারাত পাহারা দেবেন? তাঁকে ফিরে আসতেই হয়। এই নিয়ে রোজ গিন্নীদের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি চলে।

মনিবদের ব্যবহারে মা খুসি ছিলো না। চাকর-বাকর নিয়ে প্রায় জনকুড়ি লোকের রান্না করতে হয়। আমিষ নিরামিষ দু-রকমের রান্না। কেউ পেঁয়াজ খায়, কেউ খায় না। তাদের জন্যে আলাদা তরকারি। গিন্নীদের মেজাজ ভালো না। পান থেকে চুণ খসলে মহামারী কাণ্ড। চাকরি নিয়ে মার অভিযোগের অন্ত ছিল না। আমার পাশে শুয়ে শুয়ে রোজ রাত দুপুর পর্যন্ত গজ গজ করত। আমি একেকদিন বিরক্ত হয়ে বলতাম, 'না পোষায় ছেড়ে দাও বাবা। তোমাকে তো কেউ আর বেঁধে রাখেনি।'

কিন্তু আজ সেই অতিকষ্টের চাকরি হারিয়ে মার আফশোসের অবধি রইল না। সারারাত ধরে সে কেবলি দুঃখ করতে লাগল, 'মাস গেলে কুড়িটি করে টাকা তো আসত। তা ছাড়া আরো দু-চার টাকা আগাম চেয়ে আনতাম। খোরাকিটাও লাগত না। আমার ভাতের সঙ্গে তোর ভাত তরকারিও প্রায়ই নিয়ে আসতাম। এমন সুবিধে কি আর কোথাও পাব। আমার কপালই মন্দ। কোত্থেকে যে পোড়া কাসি এসে জুটল।'

রাত ভর আমার ঘুম এল না। কাসির শব্দে এবং আরো পাঁচ রকমের ভাবনায়। কাজ জুটলেও মাকে আর কোন কাজ করতে দিতে পারব না আমি। তাহলে আর ওঁকে বাঁচাতে পারব না। মাকে বাড়িতে বিশ্রাম করতে দিয়ে আমাকেই কাজের চেষ্টায় বেরোতে হবে। কিন্তু কী কাজ

করব আমি? মার মত রাঁধুনীগিরি কী ঝিগিরির কাজও করতে পারব না, আমাকে বিশ্বাস করে সে কাজ কোন গৃহিনী দেবেন না, আবার স্কুলে মাষ্টারি কি অফিসে চাকরি বাকরি করব তেমন যোগ্যতাও আমার নেই। এত বড় শহরে আমার কি কোন কাজ জুটবে না? আমি কি কোন কাজের উপযুক্ত নই?

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতে দেখি মা আগেই উঠেছে; ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে আমার স্কুলের সেই পুরোণ বইপত্রগুলি গুছিয়ে রাখছে। আজ আর বাইরে বেরোবার তাড়া নেই। আজ মা স্বাধীন। তবু এই স্বাধীনতাকে মা সুখের মনে করতে পারছে না। ঘরের কাজ করে নিজের মনকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই বললাম, 'ও সব গুছাতে তোমাকে কে বলল? খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলেই পারতে।'

মা বললেন, 'হুঁ, উঠে এবার পড়তে টরতে বসো! পড়াশুনোটা একেবারে ছেড়ে দিলি কেন লতা? শুনেছি বাড়িতে বসেও তো পরীক্ষাটা দেওয়া যায়।'

আমি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে উঠে বিছানা তুললাম, ধীরে সুস্থে হাত মুখ ধুলাম, তারপর চা করতে বসলাম। মার দিকে চেয়ে বললাম 'চা খাবে তো মা?'

মা বললেন, 'না বাবা তোমরাই খাও। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।'

আমি বললাম, 'শরীর ভালো না লাগলেই তো চা খেতে হয়। দেখ খেয়ে, তোমার সেই সরকার বাড়ির চায়ের চেয়ে আমার চা খেতে নেহাৎ খারাপ হবে না।'

মা আমার এই রসিকতার কোন উত্তর দিল না। নিঃশব্দে ঘরের কাজ করতে লাগল।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার যেন কেমন কেমন মনে হল। আমি চা করা রেখে তাঁর সামনে গিয়ে বললাম, দেখি তোমার গা।' প্রায় জোর করেই তাঁর কপালে হাত দিলাম। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। বেশ জ্বর এসেছে।

আমি তোলা বিছানা ঝেড়ে টেরে ফের পাতলাম। তারপর জোর করে তাকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়।

মা আর কোন আপত্তি করল না। শুধু ক্লান্ত অবসাদের সুরে বলল, ও বাড়ির বড় গিন্নী বোধহয় ঠিকই বলেছে লতা। আমার সেই রোগই হয়েছে।'

আমি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'না না, তোমার কিচ্ছু হয়নি মা, কিচ্ছু হয় নি। যত সব বাজে কথা।

মনে মনে আমি তখন মরীয়া হয়ে উঠেছি। কোন বিপদ-আপদকে আর ভয় করব না। ভয় করব না আর কোন শত্রুতাকে। কারো কাছে মাথা নোয়াব না। আমি দু-হাতে লড়ব, বুক দিয়ে লড়ব।

জুড়িয়ে যাওয়া চা আবার গরম করে নিলাম। শ্যামদা এসে বারান্দায় পিঁড়ি পেতে বসল। হেসে বলল, 'কই লতাদি আমার চা কোথায়?'

মার অসুখের খবর তখনও সে জানে না। কাজ ছুটে যাওয়ার খবর তখনও তার কাছে গোপন রেখেছি। শ্যামদার কথার জবাবে হাতলভাঙা চায়ের কাপটি তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'জানো শ্যামদা সেবার স্কুলের এক দিদিমণি আমাকে বলেছিলেন সংসার চালাবার জন্যে যা জোটে সব করবে। করবে না শুধু চুরি আর করবে না ভিক্ষে। কিন্তু দরকার হলে তাও আমাকে করতে হবে। পেটের জন্যে লোকে কিছুই বাদ দেয় না।'

শ্যামদা আমার দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ছি ছি ছি, ওসব কি বলছ লতাদি। ভদ্র ঘরের মেয়েরা কি ওসব কথা বলে? ও কথা মুখে আনাও পাপ।'

আমি অবশ্য তখন ভাবিনি আমার মুখের কথা এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে। প্রথম দিনই মাকে ডাক্তার দেখাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মার ভয়ে কথাটা বলতে পারলাম না। পরদিন বলে ধমক খেলাম। মা বলল, 'তুই কোন লাট সাহেবের বেটি এসেছিস শুনি? আমারই বা এমন কোন মহারোগ হয়েছে যে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে হবে। ঘরে দানাপানির ব্যবস্থা নেই, মেয়ে যায় ডাক্তার ডাকতে।' আমি তখনকার মত চুপ করে গেলাম। কিন্তু চুপ করে থাকলে অসুখ সারে না। তা বেড়েই চলল। জ্বর আর কাসির দুইয়েরই মাত্রা বাড়ল।

আমি ভয় পেয়ে শ্যামদাকে ডেকে বললাম, 'কী করব বল তো?'

শ্যামলালদা বলল, 'যেমন তুমি তেমনি তোমার মা। রোগী বলেছে আমার ডাক্তারে দরকার নেই, ওষুধে দরকার নেই। তুমিও তাই শুনে যাচ্ছ। মাথা খারাপ আর কাকে বলে?'

বললাম, 'কিন্তু ডাক্তার ডাকতে হলে টাকাও যে দরকার।'

শ্যামদা বলল, 'টাকা তো দরকারই। কিন্তু উকিল ডাক্তারের টাকা মানুষকে

জোগাতে হয় না। তা ভূতে জোগায়। আমি যাচ্ছি বিশু ডাক্তারকে ডাকতে। মাসীমা তো উঠতে পারবেন না। তাহলে ওঁকেই নিয়ে যেতাম রিকসায় করে।'
আমি বললাম, 'কিন্তু ওর ভিজিট যে চার টাকা। শ্যামদা বলল, চার টাকা না চৌষট্টি টাকা। পাড়ার মধ্যে পেশেণ্ট। দু টাকার বেশি যদি নিতে চায় বুড়ো ডাক্তারের হাত মুচড়ে ভেঙ্গে দেব না।'
বলতে বলতে বেরিয়ে গেল শ্যামলালদা। যা একখানা দশাসই চেহারা, ইচ্ছা করলে হাত সে অনেকেরই মুচড়ে ভাঙতে পারে। কিন্তু শুধু গায়ের জোরেই তো সংসারে সব কাজ হয় না।
দু টাকা ভিজিট দিলেই হয়তো চলবে কিন্তু সেই দু' টাকাই বা কই, কুড়িয়ে বাড়িয়ে যদি বা হয় ওষুধ পথ্যের দামই বা দেব কি করে, আর খোরাকিই বা কি ভাবে চলবে।
অকূল পাথারে কোন কিনারাই খুঁজে পেলাম না।
একটু বাদে ডাক্তার নিয়ে এল শ্যামলালদা। বয়স হয়েছে ডাক্তারবাবুর। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। মাথার চুল সব পাকা। সংসারের রোগ শোক জরা মৃত্যু সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার পুরুষ। তিনি পরম অভ্যস্তভাবে মার নাড়ী দেখলেন থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করলেন। খুঁটে খুঁটে রোগের বিবরণ সব জেনে নিলেন। তারপর মার সামনেই বললেন, 'চিকিৎসা আমি করতে পারি। বহু টাকা পয়সার দরকার। ব্যবস্থা আছে তার?'
আমার দিকে তাকিয়েই তিনি কথাগুলি বললেন, কিন্তু জবাব দিলেন মা। রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি একটু হাসির চেষ্টা করে বললেন 'না ডাক্তারবাবু। দেখছেন তো অবস্থা। টাকাপয়সা কোত্থেকে থাকবে। আপনি আমাকে একটা হাসপাতালে-টাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।'
ডাক্তারবাবু বললেন, 'হাসপাতালে অত সহজে বেড মেলে না। আচ্ছা সে যা হয় দেখা যাবে। ডিসপেনসারিতে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। ওষুধ দিয়ে দেব। আর ভালো খাওয়া দাওয়া দরকার। দুধ, আপেল, স্যাসপাত্তি—।'
ঘর থেকে বেরিয়ে ডাক্তারবাবু ছোট্ট উঠানটুকুতে এসে দাঁড়ালেন।
আমি তাঁর ভিজিটের টাকা শ্যামলালদার হাতে দিলাম। সে দিলে ডাক্তার বাবুর হাতে। সবিনয়ে বললে 'কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু। গরিব মানুষ দেখলেনই তো অবস্থা। তিনি টাকাটা নিয়ে পকেটে রাখলেন। বিশেষ

কোন আপত্তি করলেন না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু বাদে ডিসপেনসারি থেকে ওষুধ নিয়ে এসো, আমি কলে বেরিয়ে গেলেও কম্পাউণ্ডার থাকবে। তাকে বলে যাব। একটু ভালো হলে এক্সরে করাতে হবে। এ অবস্থায় তো আর কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না বুঝেছ।'
বুঝতে আমার আর কিছু বাকি নেই। কী ভাবে এই রোগ আর দারিদ্র্যের সঙ্গে আমি যুঝব সেই হল আমার ভাবনা। আমার আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা খুবই কম। বেছে বেছে মা তাদের দু একজনকে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু কেউ কোন জবাব দেন নি।
এত বড় এই কলকাতা শহরে কারো সঙ্গেই আমার তেমন জানা শোনা নেই। জানি শুধু স্কুলের কয়েকজন টিচারকে, আর ক্লাসের গুটিকতক মেয়েকে। কিন্তু সেই সব কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর স্কুলের ওপর আমার একটা বিদ্বেষ এসে গেছে। কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকতে আমার আর পা সরে না। তা ছাড়া গিয়েও যে কোন লাভ হবে না তা আমি জানি, কেউ আমার জন্যে কড়ে আঙুলটিও নাড়বে না। বাকি রইল শ্যামলালদা। ওর প্রকাণ্ড দেহটাই আছে। মায়া-মমতাও যে না আছে তা নয়। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি আর কর্মশক্তি দুইয়েরই অভাব। তার ফলে নিজের সংসারই ওর চলে না, আমাকে সে কি সাহায্য করবে।

ডিসপেনসারি বেশি দূর নয়। স্কুলটা যে রাস্তায় সেই রাস্তারই ওপর। শ্যামলালদার অন্ত কি দরকার ছিল। মার ওষুধ আনবার জন্যে আমি নিজেই গেলাম।

বড় রাস্তার ওপরেই ডিসপেনসারি। গোটা দুয়েক ওষুধের আলমারি, লম্বা লম্বা খানদুয়েক টুল রোগীদের বসবার জন্যে। চেয়ারগুলির রঙ কালো হয়ে গেছে। অনেকদিনের পুরোন ডাক্তার তাতে সন্দেহ নেই।
ডাক্তারবাবু নিজে ছিলেন না। রোগীরা প্রেসক্রিপসন হাতে ওষুধের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কম্পাউণ্ডার তাদের একে একে বিদায় করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'কম্পাউণ্ডার বাবু, আমার ওষুধটা'। কম্পাউণ্ডার ধমকে উঠলেন, 'আপনার ওষুধ আমি দিতে পারব না। ডাক্তারবাবু আসুন তিনি দেবেন ওষুধ। আগের দেনাটেনাগুলি শোধ দিয়ে দিন, তারপর ওষুধের কথা বলবেন।'
ভদ্রলোক মুখ কালো করে বসে রইলেন। তাঁর অবস্থা দেখে আমার মায়া

হল। সেই সঙ্গে নিজের জন্যে ভয়ও হল। আমিও তো বাকিতে ওষুধ নিতে এসেছি। আমাকেও না দশজনের মধ্যে অপমান করে বসেন।

'তোমার কি চাই ?'

কম্পাউণ্ডার বাবু এবার আমার দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই রূঢ় ভাষা আর ভঙ্গি বদলে গেল। শুধু ভদ্রভাবেই নয় গলায় বেশ একটু কোমল সুর মিশিয়েই বললেন, 'বোসো। কি দরকার বলতো।'

চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন কম্পাউণ্ডার বাবু। আমার মত গরিব, কমবয়সী মেয়ের সঙ্গে তাঁর এই ভদ্র ব্যবহার দেখে আমি একটু বিস্মিত হলাম। আমি অবশ্য চেয়ারে বসলাম না। দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, 'মার ওষুধ নিতে এসেছি। একটু আগে ডাক্তারবাবু আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন। মাকে দেখে এসেছেন। তিনি কি কিছু বলে যান নি আপনাকে ?'

কম্পাউণ্ডার বাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছেন। সতের নম্বর বস্তি তো ? দিচ্ছি ওষুধ তৈরি করে। তবে একটু দেরি হবে। এখানে বসতে যদি সংকোচ হয় ভিতরে গিয়ে বসতে পার। ওখানে মেয়েদের বসবার জায়গা আছে।'

পর্দার ওপাশে আর একখানা ছোট ঘর। খান দুই চেয়ার। একটা উঁচু টুল। আমি একখানা চেয়ার নিয়ে সে ঘরে বসে বসে ভাবতে লাগলাম বাকিতে ওষুধ নেওয়ার কথাটা কি ভাবে কম্পাউণ্ডারবাবুকে বলব। বললেই কি তিনি রাজি হবেন ? তেমনতো আলাপ পরিচয় নেই। তাছাড়া কবে যে শোধ দিতে পারব তারই বা ঠিক কি।

খানিক বাদে কম্পাউণ্ডার বাবু পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'তোমার ওষুধ তৈরি হয়ে গেছে। মিকশ্চার আর টেবলেট খাওয়াবে। তাছাড়া ইনজেকসনও রোজ একটা করে নিতে হবে।'

কম্পাউণ্ডার বাবু আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি যে কিছু বলব তা যেন তিনি বুঝতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরে অপেক্ষা করছেন।

তিনি বললেন, 'তোমার ওষুধটা তাহলে নিয়ে যাও।'

এবার আমার কথাটা না বললেই নয়। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম 'কম্পাউণ্ডার বাবু, একটা কথা বলব।'

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'বল।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'ওষুধের টাকাটা কিন্তু এখন দিতে পারব না। কদিন পরে এসে দিয়ে যাব।'

কম্পাউণ্ডার বাবু চটে উঠলেন, 'এ কি আবদার ?' টাকা সঙ্গে নেই আগেই বলা উচিত ছিল। উঁহু ডাক্তারবাবুর কথা ছাড়া আমি বাকিতে কাউকে ওষুধ দিতে পারব না।'

আমি অনুনয়ের সুরে বললাম, 'বেশি দেরি করব না। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি আপনাদের ওষুধের দাম শোধ দিয়ে যাব।'

কম্পাউণ্ডার বাবু আমার দিকে একটু অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইলেন। কালো রোগাটে পাকানো দড়ির মত চেহারা। চোখ দুটি কুঁতকুতে। দাঁতগুলি বিশ্রী, কালো আর ক্ষয়ে যাওয়া। কত বয়স আমি অনুমান করতে পারলাম না। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে বোধহয়। তাঁর চোখের দৃষ্টি আর ভাবভঙ্গি আমার ভালো লাগল না। কিন্তু না লাগলে কি হবে আমি টাকার কথা আগে না বলে ওষুধ নিয়ে অন্যায় করে ফেলেছি। এখন দাম দিয়ে ওষুধ না নিতে পারলে এগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে ?

তিনি হঠাৎ একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা স্কুলে তোমাকে নিয়েই তো একটা গোলমাল হয়েছিল ?'

আমি লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করে বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি কোন দোষ করিনি।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'আহা তুমি কেন দোষ করতে যাবে। পাড়ায় বদছেলের অভাব আছে নাকি ?'

তাঁর এইটুকু সহানুভূতিতে আমার মন নরম হয়ে গেল। কম্পাউণ্ডার আমার আর একটু কাছে ঘেঁষে বললেন, 'আচ্ছা তোমাদের চলছে কি করে বলতো ? তোমার মার তো সেই কাজটি নেই।'

আমি চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকালাম, তারপর তাঁর করুণা আকর্ষণ করবার জন্যে গলাটাকে একটু বেশি করুণ করে বললাম, 'না। আমরা খুব অসুবিধের মধ্যেই আছি।'

তিনি তেমনি সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, 'থাকবারই তো কথা। যা দিনকাল তাতে যদি কারো কাজ-কর্ম না থাকে তা হলে তো খুবই অসুবিধে। আচ্ছা, শ্যামলাল বোধহয় তোমাদের কিছু সাহায্য টাহায্য করে ?' বলে তিনি যেন একটু হাসলেন।

আমি বললাম, 'না না। সে সাহায্য করবে কোত্থেকে ? তাদেরই তো দিন চলে না। আগে আমাদের কাছ থেকেই ধার-টার নিত।'

তিনি বললেন, 'ও, তাই বুঝি? লোকের কিন্তু ধারণা—। থাক গে বাজে লোকে কত বাজে কথাই বলে।'
আমি বললাম, 'তাহলে ওষুধগুলো—।'
কম্পাউণ্ডার বাবু বললেন, 'ও হ্যাঁ, ওষুধগুলি। বড্ড দাম। তুমি আগে বল নি। তাছাড়া কবে যে টাকাটা দিতে পারবে তার তো কিছু ঠিকও নেই।'
তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'আচ্ছা একটা কাজ করো। তুমি নিয়ে যাও ওষুধগুলো। আমি যে ভাবেই হোক ম্যানেজ করে নেব। ডাক্তারবাবুকে কিন্তু কথাটা বল না। তাঁকে বলবে তুমি দাম দিয়েই নিয়েছ।'
আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'ছি ছি। তিনি কি ভাববেন।' কম্পাউণ্ডার বললেন, 'এর মধ্যে ভাববার কিছু নেই। তিনি টেরই পাবেন না। আচ্ছা আমি না হয় আমার একাউনটেই লিখে রাখব। তোমার যখন অত লজ্জা। তুমি যখন পার আস্তে আস্তে দামটা দিয়ে দিয়ো। কেমন? কোন সংকোচ কোরো না।'
বলে তিনি আমার পিঠে হাতখানা রাখলেন। তাঁর সেই স্পর্শে কী ছিল আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে বসলাম। কেমন যেন অস্বস্তি লাগল। একবার ভাবলাম ওষুধগুলি রেখেই যাই। এভাবে ওঁর কাছে বাকিতে নিয়ে কাজ নেই। কিন্তু তিনি যখন ওষুধগুলি হাসিমুখে আমার হাতে ধরে দিলেন আমি না নিয়ে পারলাম না। ভাবলাম ওষুধ না খাওয়ালে মাকে কি করে সারিয়ে তুলব?

কম্পাউণ্ডার বাবু আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় বললেন, 'শুধু ওষুধ নয়, ইনজেকসন প্রেসক্রাইব করা আছে। তোমার মার পক্ষে তো আসা সম্ভব হবে না। আমিই সব নিয়ে বিকেলবেলায় তোমাদের বাসায় যাব।'
আমি বললাম, 'কিন্তু—।'
তিনি হেসে আদরের ভঙ্গিতে বললেন, 'আবার বলে কিন্তু—। তোমার কোন ভাবনা নেই। আমি সব দেখব।'
এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত তিনি কথাগুলি বললেন যে আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারলাম না। কিসের কত দাম তা জানিনে, কী ভাবে শোধ করব তারও কিছু ঠিক নেই। ওঁর কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে এভাবে সাহায্য

নেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না তা আমি বুঝতে পারলাম কিন্তু এ ছাড়া কোন উপায় দেখতে পেলাম না। মাকে সারিয়ে তোলাই তখন আমার সঙ্কল্প। ধার করেও যদি চিকিৎসা করতে হয় তা করব। পরে যে ভাবে পারি শোধ দেব। কিন্তু কম্পাউণ্ডারবাবুর ধরণ-ধারণ ঠিক প্রত্যাশার অনুযায়ী নয়। কিন্তু তাঁর সাহায্য এতই অপ্রত্যাশিত যে আমি তা ফিরিয়ে দিতে পারলাম না।

আমি তখনও সংসারে এত বেশি পাইনি যে কোন প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে সন্দেহের চোখে দেখব, কি অবহেলা অবজ্ঞা করব।

কম্পাউণ্ডারবাবু কথা রাখলেন। তিনি অযাচিত ভাবে আমাদের বাসায় এলেন। আমি সাধ্যমত তাঁর আদর আপ্যায়ন করলাম। তিনি ডাক্তার বাবুর মতই মার টেম্পারেচার নিলেন, ওষুধ-পথ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন ইনজেকসন করলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'উনি কেমন থাকেন কাল গিয়ে আমাকে খবর দিয়ে আসবে।'

মা পরম কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন, 'সব আমি লতার কাছে শুনেছি। আপনি যা করলেন তা কেউ করে না। আমি সুস্থ হয়ে উঠলেই ওষুধের টাকা শোধ করে দেব। নিজের জন্যে নয়, ওই মেয়ের জন্যেই আমাকে সেরে উঠতে হবে।'

কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, 'আমাকে আপনি নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম ক্ষিতীশ দে। আপনার ছেলের বয়সী। আপনি আপনি করলে বড় খারাপ লাগে। আর আমার কাছে কোন সংকোচ করবেন না আপনারা। যখন যা দরকার হয় বলে পাঠাবেন।

ক্ষিতীশবাবুর এই সদাশয়তায় আমরা আরো কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম। চিকিৎসা উপলক্ষে তাঁর আর আমার যাতায়াতের ফলে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। ডাক্তারের চেয়ে কম্পাউণ্ডারই আমাদের বেশী আপন হয়ে উঠলেন। কারণ তিনি আমাদের নাগালের মধ্যে। ডাক্তারবাবু বয়সে আভিজাত্যে সব দিক থেকেই দূরের।

তারপর কম্পাউণ্ডারবাবু আস্তে আস্তে আরো ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম নানা ছলে নানা কৌশলে তিনি আমার শরীর স্পর্শ করেন। কোন কোন সময় কৌতুক বা রসিকতার ছলে হাতখানা খপ করে মুঠির মধ্যে ধরে ফেলে বলেন, 'নাও দেখি ছাড়িয়ে। বুঝব কত শক্তি হয়েছে।'

আমি বলি 'উঃ ছাড়ুন ক্ষিতীশদা। লাগছে। আমি কি আপনার সঙ্গে পারি?'
তিনি জবাব দেন, 'পার আবার না। তুমি বেশ সেয়ানা।'
আমার কিছু বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতেও পারিনে। এমন কি মার কাছেও না। বললে নিজেই জব্দ হব, বকুনি খাব। তাই কিল খেয়ে কিল চুরি করার মত আমি সহ্য করে যাই। মনে মনে ভাবি লোকটা কী! ঘরে স্ত্রী রয়েছে, চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে রয়েছে তবু একি প্রবৃত্তি! কিন্তু বাইরে কাউকে কিছু বলতে পারিনে। কেমন যেন লজ্জা করে আর ভয় হয়। এ নিয়ে একটা হৈ চৈ হলে কেলেঙ্কারি বাড়বে ছাড়া কমবে না। তা ছাড়া ওষুধ আর ইন্‌জেকসনের দেনা তো ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আমি যতটা পারি আত্মরক্ষা করি। আমি এমন ভাবে তার দিকে তাকাই যে হাত ধরা কি পিঠে হাত বুলানো ছাড়া তিনি আর কোন বাড়াবাড়ি করতে সাহস পান না। তাঁর সব ইঙ্গিত ইসারা রঙ্গ রসিকতা মাঠে মারা যায়।
ক্ষিতীশদা শেষ পর্যন্ত উত্যক্ত আর বিরক্তি হয়ে উঠলেন। কদিন আর আমাদের বাসায় মার খোঁজ নিতে গেলেন না। ওষুধ ফুরিয়ে গিয়েছিল। মার তাগিদেই যেতে হল ডিসপেনসারিতে।
হেসে বললাম, 'আপনি কি রাগ করেছেন ক্ষিতীশদা? যান টান না যে।'
তিনি বললেন, 'কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। সময় পেয়ে উঠিনে। ভালো কথা, তোমার মার ওষুধ আর ইনজেকসনের দরুণ টাকা পঞ্চাশেক জমে গেছে। ডাক্তারবাবু বড় তাগিদ দিচ্ছেন। এবারে আস্তে আস্তে দিয়ে দাও। না হলে বড় অসুবিধেয় পড়তে হবে। ওষুধতো আর ঘরে জন্মায় না। আমাদেরও দোকান থেকে কিনে আনতে হয়।'
ওর রূঢ়তার কারণ বুঝতে আমার বাকি থাকে না। আমার ভয় হয় এর পর থেকে উনি হয় তো দশজনের সামনেই আমাকে তাগিদ দেবেন আর অপমান করবেন। এদিকে টিউশনির চেষ্টা করে করে আমি হয়রান হয়ে গেছি। কেউ আমার মত মেয়েকে রাখতে চান না। ঠোঙার ব্যবসাও সুবিধা হয় না। শ্যামলালদা বড় কুঁড়ে মানুষ। তা ছাড়া টাকা পয়সা সম্বন্ধে ওর বিবেক বুদ্ধি কম। দরকার পড়লেই যা পায় তাই সব কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু এত নিয়েও তার দুঃখ সারে না। ছেলে মেয়ে শুদ্ধ উপোসের পালা চলতেই থাকে। আমারও তাই হয়। দু' একবেলা উপোসে কাটতে লাগল। মাকে গোপন

করলাম। কিন্তু নিজের কাছে গোপন করব কি করে? নিজের দেহই যে নিজেকে ছিঁড়ে খায়।

শেষ পর্যন্ত ক্ষিতীশবাবুরই শরণ নিলাম। ডিসপেনসারির সেই পর্দা ঢাকা কামরায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'আর তো পারা যাচ্ছে না ক্ষিতীশদা এবার একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিন।'

তিনি বললেন, 'হুঁ'।

আমি বললাম 'হুঁ নয়। আপনি একটু চেষ্টা করলেই পারেন। কত লোকের সঙ্গে কত জানা শোনা আপনাদের।'

তিনি একটু শ্লেষ করে বললেন, 'তোমার জানা শোনাই বা কম কিসের। কত স্কুল আছে, অফিস আছে। দেখলেই পারো খোঁজ খবর নিয়ে।'

আমি বললাম 'ম্যাট্রিকটা যদি পাশ করতে পারতাম তাহলে কোন স্কুলে কি অফিসে হয়তো কাজ একটা জুটে যেত। কিন্তু তাতো হল না। আচ্ছা কত হাসপাতাল-টাসপাতাল তো আছে। তার কোন একটায়—'

'ক্ষিতীশবাবু বললেন, 'সেও শক্ত। নার্সিংএও ম্যাট্রিকুলেট না হলে ঢোকা যায় না।' তিনি একটু থামলেন। তারপর জোর গলা নামিয়ে বললেন, 'তবে হ্যাঁ, দু'একটা ক্লিনিকের সঙ্গে আমার জানা শোনা আছে। তারা মাঝে মাঝে লোকজন নেয় বটে। করবে?' বলে তিনি আমার দিকে হেসে বেশ একটু অর্থপূর্ণভাবে তাকালেন।

আমি একটু কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'ক্লিনিক মানে?'

'তিনি আমার দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখে নিলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন 'ওই সেও এক ধরণের হাসপাতালই বলতে হবে। ছোট ছোট নার্সিং হোম, আর কি বাত টাতের চিকিৎসাই ওসব জায়গায় বেশি হয়।'

বললাম, 'আরো মেয়ে সেখানে কাজ করে?'

'তিনি বললেন, 'করে বই কি। মেয়েদেরই তো কাজ।'

'কি ধরণের কাজ সেখানে করতে হয়?'

'নার্সিং। আর আবার কি কাজ।' হাসলেন একটু ক্ষিতিশবাবু।

'কত মাইনে?'

'ষাট সত্তর, আশি। যোগত্যা দেখলে আরো বেশি টাকা ওরা দেয়।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আশি।'

আমার মা তো ভালো, আমার বাবাও কোন মাসে আশি টাকা রোজগার

করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। পারলে অত কষ্ট করে আমাদের থাকতে হত না।

সংসারের এখন যা অবস্থা তাতে আটটি টাকারও সংস্থান নেই।

আমি বললাম, 'আমাকে চাকরিটা জুটিয়ে দিন ক্ষিতীশদা। কাজকর্ম কিছু একটা না করতে পারলে মার চিকিৎসা আর চলবে না।'

শুধু চিকিৎসার দোহাই দিলাম। নিজের অন্নও যে বন্ধ হবে সে কথাটা আর মুখ ফুটে বললাম না। কিন্তু না বললেও ক্ষিতীশদা তা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন।

তিনি সহানুভূতির স্বরে বললেন—'কথা তো ঠিকই। সংসারও চালাতে হবে, চিকিৎসাও চালাতে হবে। তোমার যখন ভাই টাই কেউ নেই ছেলের কর্তব্য তো তোমাকেই করতে হবে লতা।'

আমি বললাম, 'কর্তব্য করতেই তো আমি চাই ক্ষিতীশদা। আমি বসে থাকতেও চাই না, এড়িয়ে যেতেও চাই না। আপনি শুধু আমাকে পথটা বলে দিন। আমি দিন রাত খাটব, প্রত্যেকের কথা শুনে চলব।'

ক্ষিতীশদা বললেন, 'তা যদি চলতে পার তাহলে তোমার অর্থের কোনদিন অভাব হবে না। তাছাড়া লোকের কথাও যে তোমাকে বেশিদিন মেনে চলতে হবে তা নয়। নিজেকে যদি তৈরি করে নিতে পার তাহলে দেখবে অনেকেই তোমার কথা শুনে চলছে।'

আমি তাঁর শেষ কথাগুলি তেমন লক্ষ্য করলাম না। তাই সেসব কথার ব্যঞ্জনাও বুঝতে পারলাম না। পরে অবশ্য ভালো করেই বুঝেছিলাম।

ক্ষিতীশদা বললেন, 'তোমাকে আমি সেখানে পাঠাতে পারি কিন্তু একটি সর্তে, চাকরির কথা আর কাউকে এখন বলতে পারবে না। এ সম্বন্ধে ওদের ভারি কড়াকড়ি আছে।'

আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি একটু হেসে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। চাকরি বাকরির যা বাজার আজকাল জানোই তো। আরো কত ক্যাণ্ডিডেট আছে। কে কোত্থেকে বাগড়া দিয়ে বসবে শেষে কাজটাই ফসকে যাবে। পরে তো বলতেই হবে। না বলবার কি আছে? তুমি চুরিও করছ না, ডাকাতিও করছ না। আমি এখনকার মতই কথাটা গোপন রাখতে বলছি।'

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু মাকেও বলব না?'

তিনি আবার আমার চোখের দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তা বলবে বইকি। তাঁকে না বললে চলবে কেন? বলবে হাসপাতালে তোমার একটা কাজ জুটেছে।'

আমি বুঝতে পারলাম মাকে সত্য কথাটা বলি ক্ষিতীশবাবু তা পছন্দ করছেন না। তা ছাড়া ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমি একটা গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। যদি চুক্তি মানি চাকরি জুটবে। যদি না মানি জুটবে না।

এদিকে আশি টাকার প্রলোভন অন্যদিকে অনাহারে মরবার আশঙ্কা, মাকে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেলবার ভয়। মন স্থির করা আমার পক্ষে শক্ত হল।

ক্ষিতীশবাবু একটু কোমল স্বরে বললেন, 'তুমি ভেবে চিন্তে দেখ লতা, এমন তো তাড়া নেই।'

কিন্তু ভাববার সময় আমাকে দিচ্ছে কে? রাত পোহালে আধ সের চাল ধার করবার জন্যে দোরে দোরে ঘুরতে হবে। চার আনার পয়সা কারো কাছে চেয়ে পাব না। ঘরে সোনাদানা তো ভাল, কাঁশা পিতল বলতে কিছু নেই যা বিক্রী বন্ধক চলে।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, 'ক্ষিতীশদা, আমার আর ভাববার কিছু নেই। আপনি যা হয় একটা জুটিয়ে দিন।'

ক্ষিতীশদার সঙ্গে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। পরদিন বিকেল বেলায় তিনি আমাকে সেই ন্যাশনাল ক্লিনিকে নিয়ে যাবেন। আমাকে বাসা থেকেও নেবেন না, ডিসপেনসারি থেকেও নেবেন না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বেলা চারটার সময় আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ওরই কাছাকাছি একটা বাড়িতে তিনি এক রোগীকে ইনজেকসন দিতে যাবেন। কাজ সেরে এসে সেখান থেকে আমাকে তুলে নেবেন।

পুরোন ট্রাঙ্কটায় ভালো শাড়ি আর নেই। সবই প্রায় ছেঁড়া। তবু ওর ভেতর থেকে ভদ্রগোছের একখানা শাড়ি বেছে নিলাম। গা ধুয়ে ছোট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বেঁধে নিলাম। বুকটা টিপ টিপ করছে। একই সঙ্গে ভয় আর কৌতুহল আমার বুকের মধ্যে যেন বাসা বেঁধেছে। ক্ষিতীশবাবুর ভাবভঙ্গি দেখে আমার বুঝতে বাকি নেই। প্রাণের দায়ে যে পথে যাচ্ছি তা ঠিক রাজপথ নয়, কিন্তু সে পথ যে কতটা বাঁকা কতটা গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়ে তা আমার অনুমানের বাইরে ছিল।

মা আমার সাজগোজ দেখে বালিশ থেকে মাথা তুলে বলল, 'এই অবেলায় বেরোচ্ছিস ?

বললাম, 'একটা চাকরির খোঁজ পেয়েছি মা।'

মা বলল, 'কোথায় ?'

বললাম, "একটা হাসপাতালে।"

মা জিজ্ঞাসা করল, 'কোন হাসপাতালে ?'

জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম 'তেমন নামকরা হাসপাতাল নয়।'

'কে খোঁজ আনল ? ক্ষিতীশ বুঝি ?'

সর্ত ছিল ক্ষিতীশবাবুর নামটা আপাতত গোপন রাখতে হবে। কিন্তু মা যখন নিজেই আন্দাজ করল আমি আর কথাটা অস্বীকার করলাম না। সংক্ষেপে বললাম 'হ্যাঁ।'

মা বলল, 'বড় ভাল ছেলে। কতগুলি ওষুধের টাকা বাকি রেখেছে। কেন অত ওষুধ-টোষুধ আনিস বলত লতু ? কী করে দেনা শোধ করবি ? আমার রোগ যদি সারে অমনিতেই সারবে।'

এ বুলি তো মার মুখে লেগেই আছে। আমি একথার কোন জবাব না দিয়ে বললাম, 'মা, সাবুর বাটি সামনে ঢাকা রইল। খেয়ে নিয়ো। ওঘরের যমুনা বৌদিকে বলে গেলাম। আমি না আসা পর্যন্ত তোমার খোঁজ খবর নেবে। দরকার হলে তাকে তুমি ডেকো।'

মা বলল, 'ডাকব বাপু ডাকব। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। অবেলায় বেরোলে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আর রাস্তাটাস্তা যে পার হবে—খুব সাবধান। তোমার তো আবার হুঁস থাকেনা।'

আমি এগিয়ে গিয়ে মায়ের কপালে গালে একটু হাত বুলিয়ে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, 'এমন মার জন্যে আমি কি না করতে পারি। আমার জন্য যে ভাবে আমি তার জন্য ভাবব না কেন ?'

যাবার সময় যমুনা বৌদি সামনে এসে দাঁড়ালেন। রোগা ছোট খাট চেহারা। মনে হয় এখনো কৈশোর কাটেনি। কালো কালো দুটি রিকেটি ছেলে সঙ্গে। আর একটি বাচ্চা কোল ছাড়েনি। মায়ের শুকনো স্তন প্রাণপণে টানছে। কি পাচ্ছে সেই জানে।

কিন্তু ওই অবস্থাতেও যমুনা বৌদি ঠাট্টা করতে ছাড়ল না। এক মুখ হেসে বলল 'সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? হাওয়া খেতে নাকি ?'

বউদির ছেলে কেষ্ট বড় লোভী। পাঁচ ছয় বছর বয়স হয়েছে। সারাদিন কেবল খাই খাই করে আর বাপ মার কাছে মার খায়।
সে মার কথা শুনে বলে উঠল, 'পিসি, আমার জন্যে হাওয়া এনো আমিও হাওয়া খাব।'

স্কোয়ারের মধ্যে একটি বেঞ্চে বসলাম। শীতকালের বেলা। আলো জ্বালেনি। কিন্তু এরই মধ্যে যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বায়ুসেবীদের দু'একজন আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গেল।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। খানিক বাদেই ক্ষিতীশবাবু এসে হাজির হলেন। বললেন, 'কতক্ষণ বসে রয়েছ, চল।'
আমরা ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়ে এসপ্লানেডের দিকে চললাম। গোটা দুই ষ্টপ ছাড়াতে না ছাড়াতে ক্ষিতীশবাবু বললেন 'এই যে ওঠো ওঠো। এখানে নামতে হবে।'
বাঁদিকে ছোট একটা গলি। দুদিকে ঘিঞ্জি বাড়ি। দোকানপাট লোকজনের ভিড়। কিন্তু আমি কোনদিকে না তাকিয়ে ক্ষিতীশবাবুর পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। পুরোন একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশবাবু আবার বললেন, 'এসো।'
কোথায় হাসপাতাল, কোথায় কি! এখানকার পরিবেশ আর আবহাওয়ার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে গা ছম ছম করে।
আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে ক্ষিতীশবাবু বিরক্ত হয়ে আমাকে একটু ধমকই দিলেন, 'চলে এসো। আমার দেরি করবার সময় নেই। এক্ষুনি আবার ডিসপেনসারিতে ফিরতে হবে।'
আমি যন্ত্রচালিতের মত তার পিছনে পিছনে দোতলায় উঠলাম।
প্রথম ঘরখানাই অফিস ঘর। দোরের সামনে একটি নীল রঙের পর্দা ঝুলছে। কারো অনুমতির অপেক্ষা না রেখে পর্দা ঠেলে ক্ষিতীশবাবু ঘরে ঢুকলেন। আমি ছায়ার মত তাঁর পিছনে পিছনে ঢুকলাম।
গদি আঁটা একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে স্যুট পরা মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। বেশ মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। তিনি ক্ষিতীশবাবুকে দেখে বললেন, 'এই যে কম্পাউণ্ডার বাবু আসুন আসুন। আপনি বুঝি এই মেয়েটির কথাই বলছিলেন?'

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি যেন একটু বিস্মিত হলেন। কিন্তু ক্ষিতীশবাবু বিনীত সৌজন্যে বললেন, 'হ্যাঁ, ম্যানেজারবাবু এই সেই মেয়েটি।' পরক্ষণেই এক চিলতে হাসি তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠল, 'লতা ইনিই এই ক্লিনিকের ম্যানেজার।'

ম্যানেজার তাঁর দুটি চোখ আমার সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিলেন। মনে হল খুসিই হলেন তিনি।

বললেন, 'নামটিতো বেশ। পদবীটি কি?'

বললাম, 'লতা ভট্টাচার্য।'

তিনি বললেন, 'ব্রাহ্মণ? বেশ বেশ। এখানে বামুনের মেয়ে আরো আছে। কি ভাবে কাজ কর্ম করতে হবে ক্ষিতীশবাবুর কাছে থেকে সব শুনে নিয়েছ তো?'

মৃদুস্বরে বললাম, 'না সব শুনিনি।'

তিনি একবার ক্ষিতীশবাবুর দিকে তাকালেন, তারপর ফের আমার দিকে চেয়ে খানিকটা কোমল স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, আস্তে আস্তে দেখে শুনে নিলেই হবে। বুঝে নিতে বেশি সময় লাগবে না তোমার।'

তবু জিজ্ঞাসা করলাম 'কি করতে হবে আমাকে?'

তিনি বললেন, 'কি আর করতে হবে? এখানে বাতের রোগীরাই বেশি আসে। অবশ্য অন্য রোগীও আছে। ডাক্তাররা যে সব তেল কি মালিশ প্রেসক্রাইব করে দেয় সেগুলি পেশেন্টদের লাগিয়ে দিতে হবে। কাজ কিছুই এমন শক্ত নয়। সে তুলনায় মাইনে আমরা বেশিই দিয়ে থাকি।'

পাশের ঘর থেকে কয়েকটি মেয়ের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ ভেসে এল। ম্যানেজার একটু বিরক্ত হয়ে টেবিল চাপড়ে বললেন, 'আঃ বড় গোলমাল হচ্ছে। রাণী এ ঘরে এসো একবার। দরকার আছে এখানে।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসি আর কথা থেমে গেল। একটু বাদে আর একটি মেয়ে এসে ম্যানেজারের টেবিলের পাশে দাঁড়াল। মেয়ে না বলে মহিলা বলাই ঠিক। ত্রিশ বত্রিশ হবে বয়স। গায়ের রঙ ময়লা। কিন্তু নাক-চোখ বেশ টানাটানা। একটু মোটা না হয়ে পড়লে সুন্দরীই বলা চলত।

ম্যানেজার বললেন, 'এ হল তোমাদের ইনচার্জ। এর কাছ থেকে কাজ বুঝে নেবে। এর কথা শুনে চলতে হবে। ধীরে সুস্থে একে তালিম দিয়ে নিয়ো রাণী। তাড়া হুড়োর দরকার নেই।'

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো।'
আমি ক্ষিতীশবাবুকে বললাম, 'আজ থাক। আমি বরং কাল থেকে—।'
ক্ষিতীশবাবু বললেন, 'সেকি এত কষ্ট করে এলে। ভিতর থেকে একটু অন্তত দেখে শুনে যাও।'
রাণী আমাকে নিয়ে যেতে যেতে একটু হেসে বলল, 'না দেখতেই ঘাবড়ে গেলে নাকি? ভয়ের কিছু নেই। গোড়াতে সবারই অমন একটু কেমন কেমন লাগে। তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই সব ঠিক হয়ে যায়। এসো আর দেরি কোরো না। তোমাকে তো ম্যানেজার দেখা মাত্রই পছন্দ করে ফেলেছে। তোমার আর কি।'
সকলের প্রবল ইচ্ছা আমাকে পর্দা ঢাকা ঘরগুলির দিকে টেনে নিয়ে চলল। আমার একার অনিচ্ছা কোন কাজেই এল না।
এ্যাসবেসটাসের পার্টিসন দেওয়া ছোট ছোট কামরা। দরজার সামনে পুরু পর্দা। তার ভিতরে মৃদু কথা-বার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।
আমি বললাম, 'ওসব ঘরে কি হচ্ছে?'
রাণীদি হেসে বলল, 'কাজ হচ্ছে। মালিশ গো মালিশ। মানুষগুলির বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা। গিঁঠে গিঁঠে ব্যথা শরীরের। সেই সব ব্যথা সারাবার জন্যেই ওরা এখানে আসে। দু চারদিন কাজকর্ম করলেই সব বুঝতে পারবে।'
মনে মনে ভাবলাম আমার আর বুঝে কাজ নেই। এই শেষ। না খেয়ে মরব তবু এখানে আর ফিরে আসব না।
বাড়িতে আমার অসুস্থ মা রয়েছেন এই অজুহাত দেখিয়ে আমি তাড়াতাড়ি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ক্ষিতীশবাবুও চললেন আমার সঙ্গে। পথে যেতে যেতে আমি তাকে বললাম, 'ছিঃ আপনি এই কাজের জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছেন? এই আপনার হাসপাতাল?'
ক্ষিতীশবাবু বললেন, 'কেন কাজটা খারাপ কিসের? কত ভদ্রঘরের মেয়ে এই করে সংসার চালাচ্ছে তা জানো? তা ছাড়া আমি তো তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি। সব খুলেই বলেছিলাম। বেশ, তোমার যদি এ কাজ পছন্দ না হয় ওদের না করে দিলেই হবে। ব্যাপারটা আগেই বলা উচিত ছিল তোমার। এখন ছেলেমানুষি করার কোন মানে হয় না।'
ক্ষিতীশবাবুর রাগের বহর দেখে আমি মনে মনে হাসলাম। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি ওর উদ্দেশ্য। উনি প্রতিশোধ নিচ্ছেন। আমি ওঁর ইঙ্গিতে রাজী

হইনি তাই এই শাস্তি। কিন্তু আমাকে শুধু যে শাস্তি দেওয়ার জন্তেই এনেছেন তা নয়, ওঁর নিজেরও পুরস্কারের আশা আছে। মনে হল ম্যানেজারের সঙ্গে তার আলাপের সময় কমিশন কথাটা যেন বার দুই শুনতে পেয়েছিলাম।

বাসায় ফিরে এসে দেখি মা উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। আমাকে দেখে রাগ করে বলল, 'কোথায় ছিলি এত রাত্ত পর্যন্ত ?'

আমিও ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'তোমাকে তো বলেইছি চাকরির খোঁজে গিয়েছিলাম। কোন কাজকর্ম না জুটলে যে উপোস করে মরতে হবে।'

মা নরম হয়ে বলল, 'তাতো জানি। তাই বলে একটু বুঝে সমঝে চলবি তো। পাড়াটাতো ভালো নয়। সেইজন্তেই বলি

সারারাত আমার ভালো করে ঘুম হল না। ক্লিনিকের যে আবহাওয়া দেখে এলাম তাতে ওখানে আমার আর ঢুকতে ইচ্ছা নেই। কিন্তু ইচ্ছা না থাকলে উপায়ই বা কি। হাঁড়িতে চাল বাড়ন্ত। মার এক ফোঁটা ওষুধ নেই, পথ্যের কোন ব্যবস্থাই করে রাখতে পারিনি। টাকার অভাবে এক্সরে পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। বাড়িওয়ালা থেকে শুরু করে মুদি, কয়লাওয়ালা সবার কাছেই আমরা ধারি। আমি যমুনা বউদির চেয়েও অধম হয়ে গেছি। পাড়া পড়শি কারো কাছে হাত পাততে বাকি রাখিনি। এখন হাত পাতলেও কিছু মেলে না। কাজ না নিয়েই বা আমার কি গতি আছে।

পরদিন ভোরে উঠে চা খেলাম না। কারণ তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। শ্যামলালদা একবার উঁকি মেরে লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল। মার গালাগাল সত্বেও আমি রান্নার কোন আয়োজন করলাম না। ভাঁড়ারে কিছুই নেই। ধারের জন্তে কত আর পরের কাছে যাব। চেয়ে চেয়ে মুখ হারাব। তার চেয়ে না খেয়ে মরা ভালো। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই টের পেলাম না খেয়ে মরা সহজ নয়। প্রাণটা যেমন করে হোক টিঁকে থাকতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষার কাছে আর সব জিনিসই তুচ্ছ।

পরদিন আবার এলেন ক্ষিতীশবাবু। ফের মার খোঁজ খবর নিতে এসেছেন। মা তাঁকে পরম আত্মীয়জ্ঞানে বলতে লাগলেন, 'দেখতো মেয়ের আক্কেল। ঝগড়া ঝাঁটি করে আজ আর রাঁধলও না খেলও না। এমন করলে কি করে বাঁচবে বলতো।'

ক্ষিতীশবাবু একটু হেসে বললেন, 'লতার সবই ভালো, কিন্তু বড় জেদী। আপনিই বলুন মাসীমা সব সময় কি নিজের জেদ নিয়ে থাকলে চলে ?'

মা হতাশার সুরে বলল, 'সব আমার কপাল।'

এরপর ক্ষিতীশবাবু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে দুখানা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরলেন, 'ম্যানেজার বাবুকে বলে কিছু আগাম নিয়ে এলাম। অবুঝের মত কোরো না। অবস্থা বুঝে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'
আমার একবার ইচ্ছা হল নোট দুখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠাস করে কম্পাউণ্ডারের গালে একটা চড় বসিয়ে দিই! কিন্তু যা করলাম তা একেবারে উল্টো। পোষমানা বিড়ালের মত টাকাগুলি হাত পেতে নিলাম।
ক্ষিতীশবাবু বললেন, 'তোমার কোন ভয় নেই। আমি আজ তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেব। তাছাড়া কেউ না জানতে পারলেই হল। এই শহরে কতজনে কত কি করে খাচ্ছে। কে আর কার হাঁড়ির খবর রাখতে যায় তা বল।'
তারপর একটু থেমে আশ্বাসের সুরে বললেন, 'এরপর যদি কোন বেটার চান্স পাও সেখানে চলে যাবে। তোমাকে তো কেউ আর চিরদিনের মত আটকে রাখতে পারবে না। কাজ করা না করা তোমার ইচ্ছাধীন। বিপদে আপদে পড়লে সবই করতে হয়। তারপর সুদিনের নাগাল পেলে এসব কথা আর কে মনে করে রাখে।'
সুতরাং নিলাম চাকরি।

এরপর থেকে আমার জীবন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। পর্দার সামনে একরকম পর্দার আড়ালে আর একরকম! সেই আমি প্রথম গোপন করতে শিখলাম, আর পাঁচজনের কাছ থেকে নিজের কাজ-কর্ম, চিন্তা ভাবনা সব লুকোতে শিখলাম। সেই প্রথম আমি মিথ্যা আচারে অভ্যস্ত হলাম। তারপর আস্তে আস্তে সেই অভ্যাস আমার স্বভাবে পরিণত হল।
শ্যামলালদা জিজ্ঞেস করে, 'রোজ তুমি বাসে করে কোথায় যাও লতাদি।'
আমি জবাব দিই, 'একটা নার্সিং হোমে কাজ পেয়েছি।'
শ্যামলালদা বলে, 'কিন্তু ও পাড়াটা তো ভালো নয়। সন্ধ্যার দিকে ওদিকে না যাওয়াই ভালো।'
আমি বলি, 'ঠগ বাছতে গাঁ যে উজাড় হয়ে যায় শ্যামদা। এ পাড়াটাও সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম তা আমার মনে হয় না।'
ক্লিনিকের কাজ করতে প্রথমে আমার গা ঘিন ঘিন করত। অপরিচিত পুরুষের গায়ে তেল মালিশ করতে আমার সংকোচের অবধি থাকত না। কিন্তু দিন

কয়েকের মধ্যে সেই সংকোচ কেটে গেল। আপনা আপনি যে গেল তা নয়। রাণীদির শাসনে ধমকে আমি বদলাতে লাগলাম। সে আমাদের ইনচার্জ, ট্রেনার সব। মালিশের কাজটা সে আমাকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিল। আমার একটু দ্বিধার ভাব দেখলেই সে ধমকাত, 'নাচতে নেমে আবার ঘোমটা টানা কেন। মুখপুড়ী এখানে যখন মরতে এসেছিস ভালো করে মর। আধমরা আধপোড়া হয়ে থাকিস নে।'

সে আমাদের ধমকাত, শাসন করত আবার ভালোও বাসত। কোন পেশেণ্ট মদটদ খেয়ে এসে বেয়াড়া ব্যবহার করলে রাণীদি তাদের খুব ধমকাত। আমাদের পক্ষ নিয়ে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিত। শুনেছি রাণীদি মালিকের প্রিয়পাত্রী। সেই জোরে সে ম্যানেজারকেও ভয় করে না। সবাইকে তুড়ি দিয়ে চলে।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে আমি মার এক্সরের ব্যবস্থা করলাম। ট্যাক্সি করে নিয়ে গিয়ে এক্সরে প্লেট করালাম। প্লেটে কয়েকটা স্পট অবশ্য ধরা পড়ল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'ইনজেকসনের কোর্স চলতে থাকুক এমন কিছু মারাত্মক হয়নি। আশা তো করি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।'

আমারও তো সেই আশা। কম্পাউণ্ডারবাবু ইনজেকসন দিতে আসেন আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, 'কি তোমার কাজকর্ম ভালো চলছে তো!'

আশ্চর্য এখন আর তিনি আমার হাত ধরেন না, আমাকে স্পর্শ করার জন্য অত লুব্ধ হয়ে ওঠেন না, আমাকে আর পাঁচজনে ছিঁড়ে খাচ্ছে এই কল্পনা করেই তার আনন্দ।

কিন্তু চিকিৎসায় মার শরীর ভালো হওয়া দূরে থাক তার রোগ যেন বেড়েই চলেছে। দেহ আরো ক্ষীণ হয়, মেজাজ আরো রুক্ষ। আমার সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতে চায় না। পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। নিজের মনে বিড় বিড় করে কি যেন বকে। মাঝে মাঝে বলে 'ছি ছি ছি। এর চেয়ে মরণ ভালো ছিল।'

আমি জানি মা আমাকে সন্দেহ করছে। আমার মিথ্যাচার তাঁর কাছ গোপন নেই। কিন্তু সে কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করবার সাহসও নেই তার। সে জানে আমি যা করছি তা না করলে শুধু যে ওষুধপথ্য জুটবে না তাই নয়, দানাপানি বন্ধ হবে, ঘর ছেড়ে পথে নামতে হবে। মা সবই বোঝে, তবু তার মন বুঝতে চায় না।

একদিন থলিতে করে আমি কিছু আপেল আর ন্যাসপাতি নিয়ে এলাম। নিজের হাতে মার শুশ্রূষা করবার সময়তো আমার হয় না। সে ভার আমি

দিয়েছি যমুনা বউদিকে। সেই মার সেবা, যত্ন করে তার বদলে আমি তাকে পাঁচ টাকা করে দিই। তা ছাড়াও দু' আনা চার আনা ঠেকলে তো ওরা নেয়ই। ভরসা দিয়েছি আরো বেশি দেব।

আজ নিজের হাতে আপেল কেটে মার মুখে আমি তুলে ধরলাম, 'নাও মা খাও।'

হঠাৎ মা করল কি সেই আপেলের টুকরো কটা দূর দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিল আমি তো অবাক। দামি জিনিস। গায়ের রক্ত জল করা পয়সায় কেনা। এ জিনিস মা এমন করে নষ্ট করল। এ কি খেয়াল?

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কি হল তোমার। এমন করে ফেলে দিলে কেন?'

মা বিকৃত মুখে বলল, 'দেব না? ফল তো ভালো, তোর হাতের জল খাওয়াও পাপ। তোর হাতের ছোঁয়া খেলেও নরকে যেতে হয়। লতি কেন তুই এর চেয়ে মরে গেলিনে, আমি যে তাহলে বাঁচতাম।'

হঠাৎ মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মার চোখের জল মুছে দেওয়ার জন্তে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম না। তীব্র ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'বেশ তো না খেতে চাও না খেলে। দেখি কদিন না খেয়ে পার।'

বাইরে এসে আমি শ্যামলালের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। আলো জ্বালবার মত তেল নেই। অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রী কাছাকাছি বসে কি যেন ফিস ফিস করছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'শ্যামদা।'

শ্যামলাল বেরিয়ে এসে বলল, 'কি বলছ লতাদি?'

আমি রূঢ় স্বরে বললাম, 'তোমরা আমার কাছ থেকে টাকা নেবে, চাল নেবে আবার আমার নামেই আমার মার কাছে কুৎসা রটাবে, একি নেমকহারামি তোমাদের?'

শ্যামলাল বলল, 'আমি তো কিছু বলিনি লতাদি। তুমি মিথ্যে আমাকে সন্দেহ করছ।'

যমুনা-বউদি স্বামীকে রক্ষা করবার জন্তে এগিয়ে এল, 'আমাদের কেন মিছিমিছি দোষারোপ করছ? আমরা মামিমাকে একটি কথাও বলিনি। তাই বলে বলবার লোকের তো অভাব নেই। তের নম্বর ঘরের বকুলের মা দেখতে এসেছিল। সে যেন কি বলে গেছে। বকুলের বাবা নাকি তোমাকে কোত্থেকে

বেরোতে দেখেছে। শুধু বকুলের মা-ই বা কেন। বাড়ি শুদ্ধ লোকই তো এই নিয়ে হাসাহাসি করছে, ঘোঁট পাকাচ্ছে। তুমি ক'জনের মুখ চাপা দেবে লতাদি।'

শ্যামলাল এবার স্ত্রীকে ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ কর মাগী, চুপ কর। তোর অত কথায় কাজ কি।'

আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। কাঁদতে চাইলাম। কিন্তু কান্না পেল না। বুকের ভিতরটা শুধু জ্বলে যেতে লাগল।

অথচ তখনো আমি যাকে বলে 'খারাপ হওয়া' তা হইনি। কাষ্টমাররা শুধু যে হাত পায়ের বাত সারাতে আর রক্ত সঞ্চালনের সাহায্য নিতেই এখানে আসে তা নয়। তাদের উদ্দেশ্য আরো নিগূঢ় তা আমি প্রথম থেকেই টের পেয়েছিলাম। পেশেণ্টদের কাছে ইসারা ইঙ্গিতও কম পাইনি। কিন্তু সাড়া দিইনি। আমার গা ঘিন ঘিন করেছে। এখানে যারা আসে তারা হয় কাপুরুষ না হয় কুপুরুষ। কেউ কেউ দেখতে রীতিমত কদাকার। বিগত যৌবন বিকৃত রুচি প্রৌঢ়দেরই ভিড় এখানে। তাদের দেখে আমার বিতৃষ্ণাই জাগত। প্রণয় উদ্রেক হত না।

এ নিয়ে রানীদিরা খুব ঠাট্টা তামাসা করত, 'এখানে এসে মরলিই যদি অত সতীপনা কিসের? সতীপনা করলে কি টাকা রোজগার হয়? এখানে উপরি পাওনাই তো আসল। না কি রোগ ব্যামোর ভয়? তা তোর ভাবের কম্পাউণ্ডার তো বাঁধাই আছে। তোর অত ভয় কিসের?'

মালতী বলত, 'তুমিও যেমন রানীদি। ও ডুবে ডুবে জল খায়। ভিজে বেড়াল। ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।'

রানীদির অধীনে আমরা তখন আটজন ছিলাম। দুটো সিফ্‌টে কাজ চলত। দুপুর থেকে সন্ধ্যা আবার সন্ধ্যা থেকে রাত দুপুর। এই আটটি মেয়ের প্রত্যেককে নিয়ে একখানি করে বই লেখা যায়। আবার যে কোন এক জনের কথা তো আর একজনের কথারই প্রতিধ্বনি। তাই একজনের জীবনীর মধ্যেই আমাদের প্রত্যেকের জীবন মিলে আছে। আমার কথা থেকে ওদের কথা আলাদা নয়। ওদের মধ্যে আমার চেয়েও বেশি হতভাগিনী ছিল। কেউ বা নামমাত্র সই করতে জানে কেউ বা তাও জানে না। কারো বা বাপ-মা নেই, কারো বা থেকেও আধমরা হয়ে আছে। সবাই যে ভদ্রঘরের

তাও নয়। কেউ কেউ বেশ্যাপল্লী থেকেও এসেছে। কিন্তু সেকথা মুখে কেউ স্বীকার করে না। সবাই এখানে নাম ভাঁড়ায়, জাত ভাঁড়ায় জীবন ভাঁড়ায়। এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। এখানে একজনের সঙ্গে আর একজনের শুধু প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। তবু এমন আবহাওয়ার মধ্যেও আমরা বলতে গেলে মিলেমিশেই কাজ করতাম। ঝগড়া ঝাঁটির পর সুখ-দুঃখের কথার বিনিময় চলত।

কিন্তু আবার আমাকে অভাবে ধরল। মানে আশী টাকা মাইনের কথা শুনে কি আনন্দই না হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখলাম আশি টাকা কিছুই না। মাসের পনের দিন যেতে না যেতে সে টাকা ফুঁয়ে উড়ে গেল। যাবে না? বকেয়া দেনা দায় কি কম ছিল? যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই পাওনাদার। তা ছাড়া ঘরে একজন থাইসিসের রোগী। আমার অভাব কি অত সহজে মেটে? আমি একবার এগোই একবার পেছোই, কখনো সঙ্গিনীদের বাড়তি উপার্জন দেখে হিংসায় জ্বলি, কখনো নিজের কাছেই নিজের সততার বড়াই করি।

মালিশ করাতে নানা রকমের লোকও আসত। টাকপড়া ভুঁড়িওয়ালা মাঝবয়সীদের সংখ্যাই তার মধ্যে বেশি। তাদের দেখেই আমার বিতৃষ্ণা জাগত। গায়ে হাত দিতে গা বমি বমি করত। কিন্তু তারা তাই বলে ইসারা ইঙ্গিত আর প্রেম নিবেদন করতে ছাড়ত না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি রানীদির আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করতাম।

কিন্তু একদিন এক কাণ্ড ঘটল। ম্যানেজারের কাছে টাকা জমা দিয়ে যে এসে আমার ঘরে ঢুকল সে একটু ভিন্ন ধরণের লোক। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, পরনে দামী স্যুট। মুখ দেখলেই মনে হয় বেশ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান। বয়স সাতাশ আঠাশের বেশি হবে না। আমি ভাবলাম, 'এমন একজন ভদ্রলোক এখানে এল কেন?'

মনে হয় সেও আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। হয়তো সেও ভাবল, 'এমন একটি সুন্দরী মেয়ে কেন এল এখানে?' ঘরের এক কোণে ছোট একখানা চেয়ার ছিল। সেই চেয়ারে সে বসে রইলো। বসে বসে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। খানিক বাদে বললাম, 'আপনি কি ম্যাসাজ নেবেন না? তাহলে জামা-টামাগুলি খুলে ফেলতে হবে!'

সে বলল, 'Massage? I hate the idea, আমার এসব সহ্য হয় না। এক আধদিন experiment করে দেখেছি। বিশ্রী রকম সুড়সুড়ি লাগে।'

সুড়সুড়ি কথায় আমার হাসি পেল। আমি বললাম, 'তাহলে এখানে এলেন কেন?'

সে বলল, 'যে জন্যে সবাই আসে। এলাম তোমার সঙ্গে গল্প করতে।'

আমি মুখ নামিয়ে নিলাম। একটু বাদে বললাম, 'কি গল্প করতে চান বলুন।'

সে বলল, 'গল্প করতে চাইনে। তার চেয়ে তোমার কাছে গল্প শুনি। এত কাজ থাকতে তুমিই বা একাজ বেছে নিলে কেন?'

আমি বললাম, 'যে জন্যে সবাই নেয়। দায়ে পড়ে।'

সে মাথা নেড়ে হাসল, 'আমি বিশ্বাস করিনে। ওকথা সবাই বলে। তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে টেনে এনেছে। যেমন আমার প্রবৃত্তি এনেছে আমাকে।'

আমি বললাম, 'আপনার কথা মোটেই ঠিক নয়। আপনি নিজের মাপ-কাঠি দিয়ে অপর সবাইকে যাচাই করছেন।'

সে একটু চমকে উঠল তারপর হেসে বলল, 'বটে! আমরা সবাই তাই করি। অন্যকে ওজন করবার ওই একটা মাত্র বাটখারাই আমাদের হাতে আছে।'

সে উঠে যাওয়ার সময় আমার হাতে দশ টাকার একখানা নোট গুঁজে দিল। আমি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললাম, 'এ কি? টাকা তো আপনি ম্যানেজারের ঘরেই দিয়ে এসেছেন। এখানে তো দেওয়ার নিয়ম নেই।'

সে হেসে উঠল, 'এই অনিয়মের রাজ্যে তুমি তো ভারি মজার কথা বলছ—নিয়ম নেই!'

বললাম, 'কিন্তু আমি তো আপনার কোন কাজ করে দিইনি '

সে বলল, 'সেইজন্যে তোমার টাকা নিতে বাধছে? ভারি অদ্ভুত মেয়ে তো তুমি। এতক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে যে কথা বললাম, গল্প করলাম, এর দাম কি কম? আচ্ছা মনে করো আমি টাকাটা তোমাকে ভালোবেসেই দিলাম।'

ভালোবাসা কথাটা সে অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করল।
আমাদের মতের মিল হল না। কোন পরিচয়ও হল না। তবু সে আসতে লাগল। সপ্তাহে দু'দিন তিন দিন কি আরো বেশি। তার সংযম আর ধৈর্য দেখে আমি অবাক হলাম। সে কম্পাউণ্ডারের মত নয়, কি অন্য কোন রোগীর মতও নয়। সে ছুঁই ছুঁই করে না, তার কোন কাঙালপনা নেই।

আস্তে আস্তে আমি তার নাম জানলাম। নীলাম্বর রায়। সে বলল, 'তোমার নাম আমি আগেই জানি। আমাকে তুমি নাম ধরেই ডেকো।'
আমি বললাম, 'নাম ধরে।'
নীলাম্বর বলল, 'হ্যাঁ, অনর্থক একটা বাবু জুড়ে দিলে আমার বেশি সম্মান হবে না। অশ্রদ্ধা আর অসম্মান আমার অঙ্গের ভূষণ। মনে মনে দুর্নাম তো করছোই। তবু তোমার মুখে নিজের নামটা শুনলে আমি খুশি হব।'
আমি তার কথা আর কারো কাছে বলিনি। কিন্তু তার চিন্তা আমার মনকে সারা দিনরাত আচ্ছন্ন করে রাখে। তাকে দেখতে আমার ভালো লাগে, তার কথা শুনতে ভালো লাগে। সে না এলে, অস্বস্তির অন্ত থাকে না।
রানীদিরা ঠাট্টা করে বলে, 'তুই মরেছিস।' আমি জানি, না মরলে যে বাঁচবার স্বাদ পাওয়া যায় না।
তারপর নীলাম্বর একদিন সন্ধ্যাবেলায় এসে বলল, 'চল বাইরে। এখানে বড় গুমোট।'
আমি বললাম, 'ম্যানেজার বাবু—।'
নীলাম্বর বলল, 'সেজন্যে ভেব না। তার কাছ থেকে ছুটি মঞ্জুর করবার মন্ত্র আমার জানা আছে।'
হেঁটে না, ট্রামে বাসে না, নীলাম্বর একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির। সে আমাকে প্রায় জোর করেই তুলে নিল। আমি বাধা দিতে পারলাম না। পাশে বসে সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমার ছাড়িয়ে নেওয়ার শক্তি হল না।
অথচ তখনো আমি তার ঠিকানা জানিনে, পুরোপুরি পরিচয় জানিনে। সে কি করে তাও আমার জানা নেই। তবু আমি তাকে বিশ্বাস না করে পারলাম না, তার আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে সঁপে না দিয়ে পারলাম না।

নীলাম্বর ঠিকই বলেছে। একবার প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির যদি মিল হয় তাহলে আর কোন অমিলেই আটকায় না। এতদিন অপ্রবৃত্তিই আমাকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু এতকালের অবরুদ্ধ ধারা আজ যখন ছাড়া পেল সে সব বাঁধ সব বিচার-বিবেচনা নিমেষে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

শুধু গাড়িতে করে বেড়ানো নয়, কোন কোন রাত্রে সে আমাকে হোটেলে নিয়ে উঠল। প্রথমে প্রথমে খেতে খেতে গল্প। নানা রকমের সুস্বাদু খাবার। আমি এর আগে তা মুখেও দেইনি। তারপর সুন্দর সুসজ্জিত ঘর। খাটে চমৎকার করে শয্যা বিছানো। ড্রেসিংটেবিল আয়না বসানো দামি আলমারি। সুখ-স্বাচ্ছন্দের কিছু অভাব নেই। কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান তার আদর। দেহের মধ্যে যে এত রহস্য, দেহের মধ্যে যে এত আনন্দ, দেহ যে একই সঙ্গে মধুর আর মদিরার খনি এর আগে তো তার সন্ধান পাইনি। জীবনে এত রূপ এত রস থাকতে মানুষ কেন উপবাসী থাকে ?
আমি যত আনন্দ পেলাম, তত আনন্দ দিতে লাগলাম। শুধু নীলাম্বরকে নয়, জগৎ সংসারকে যতটুকু সময় পাই প্রাণ দিয়ে তার সেবা শুশ্রূষা করি, দুহাতে সাহায্য করি শ্যামলালদের, আমার ভিতরের প্রাণশক্তি যেন আরো বেড়ে গেছে।

একদিন তাকে বললাম, ‘চল তোমাকে আমি আমার মার কাছে নিয়ে যাই।’
সে একটু বিস্মিত হয়ে বলল, ‘মার কাছে, কৈন ?’
আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, ‘বাঃ মার কাছে যেতে হবে না ? তিনি আমাদের দুজনকে দেখলে কত খুশি হবেন।’
নীলাম্বর একটু যেন বিস্মিত হয়ে বলল, ‘খুশি হবেন ?’
আমি বললাম, ‘খুশি হবেন বই কি। ‘তুমি আমাকে ভালোবাসো একথা শুনলে তিনি খুশি হবেন না ?’
নীলাম্বর চিন্তিত হয়ে বলল, ‘আচ্ছা একটু ভেবে দেখি। সুবিধে মত একদিন যাব।’
আমি ওর ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হই। ওতো মার চিকিৎসার জন্য টাকা দেয় কিন্তু তার সামনে যায় না কেন ?
আমি প্রায়ই ওকে একথা বলি। কিন্তু আমার যেমন আগ্রহ ওর যেন তত গরজ নেই। নানা ওজর আপত্তিতে ও কেবলই দেখা করার তারিখটা পিছিয়ে দেয়।

আমি আশা করে থাকি ও একদিন বলবে, 'এবার তুমি ক্লিনিকের কাজ ছেড়ে দাও লতা। ও কাজ তোমায় মানায় না।'

আমি প্রত্যাশা করি, নীলাম্বর একবার বলবে 'এসো আমরা বিয়ে করি, ঘর বাঁধি।'

আমার মা একটা সমস্যা বটে। কিন্তু তাঁকে ভালো কোন হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেই হবে। আমার ধারণা নীলাম্বরের সে ক্ষমতা আছে।

তারপর ওর কাছ থেকে আমি সত্যিই কথা আদায় করে নিলাম। ও বলল, 'আচ্ছা, কালই যাব। তুমি যখন অত করে বলছ।'

আমি বললাম, 'না গেলে কিন্তু আর মুখ থাকবে না।'

নীলাম্বর বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা।'

সেদিন গাড়িতে করে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেরালাম। গঙ্গার ধার দিয়ে খিদিরপুর ডক অবধি গেল। আবার ফিরে এল। তারপর আমাদের বড রাস্তার মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'এত কাছাকাছি এসে ফিরে যাবে? চল না আমাদের বাসায়।'

নীলাম্বর বলল, 'ক্ষেপেছ? এত রাত্রে তোমার মার শান্তি ভঙ্গ করতে যাওয়ার কি কোন মানে হয়? কাল অবশ্যই যাব।'

'কখন?'

নীলাম্বর বলল, 'সন্ধ্যায়।'

সেদিন রাত্রে বাসায় ফিরতে আমার সত্যিই খুব দেরি হ'য়ে গেল। মা আমাকে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, 'ছি-ছি-ছি লোকে যা বলে তার এক বিন্দুওতো মিথ্যে নয়। তুই এমন করে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়েছিস? আর যে আমার সয় না। আমাকে বিষ এনে দে আমি তাই খেয়ে মরি। ওষুধ আর আমার জন্য তুই আনিসনে।'

আমি শান্তভাবে বললাম, 'মা, তুমি মিছেই রাগ করছ। সে তোমাকে কালই প্রণাম করতে আসবে। সে আমাকে কথা দিয়েছে।'

মা মুখ ভেঙচিয়ে বলল, 'কথা দিয়েছে।'

অন্ধকারে পাশাপাশি বিছানায় আমরা দুজন চুপচাপ শুয়ে রইলাম। বহুক্ষণ কেউ কোন কথা বললাম না।

তারপর মা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার কপালে

হাত রাখল, 'হ্যাঁরে সত্যিই সে কথা দিয়েছে তো! তোকে সে সত্যিই বিয়ে করবে?'
আমি বললাম 'হ্যাঁ'।
মনে মনে ভাবলাম পরিষ্কার কথা অবশ্য সে দেয়নি। কিন্তু যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাতে কি আর সে বিয়ে না করে পারে?
মা আবার জিজ্ঞেস করল, 'বামুনের ছেলে তো'?
আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।
মনে মনে ভাবলাম বামুন না হলেই বা কি এসে যায়। সিভিল ম্যারেজ তো আটকাবে না।

পরদিন কাজে বেরোব, মা বাধা দিয়ে একটু হেসে বলল, 'সে-ই যখন আসবে বলেছে তোর আর বেরিয়ে দরকার নেই।'
আমি লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করলাম। মনে মনে ভাবলাম, সে-ই ভালো। সেই আসুক এখানে। আজ খোঁজ করে আসবার কথাতো তারই।
সারাদিন আমি ঘর সাজালাম, ঘর গুছালাম। সাজাবার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। বস্তির ছোট ঘর। ওপরে টালির চাল। দুটি করে ছোট ছোট জানলা। আক্ষরিক অর্থে কপাট। আসবাবপত্র যা ছিল সবই তো বিক্রি বন্ধক দিয়ে সেরেছি। এখন আছে শুধু পুরোন হাঁড়ি কড়া আর এনামেলের কিছু বাসনপত্র। তাই মেজে ঘষে পরিচ্ছন্ন করলাম। বাক্স থেকে একখানা ধোয়া চাদর বের করে পুরোন মাদুরের নোংরা আর ছেঁড়া জায়গা ঢাকলাম। বস্তির মুখ দিয়ে একটি ছেলে প্রায়ই নানারকমের ফুল নিয়ে যায়। অন্যদিন ফুল কেনার সখও থাকে না পয়সাও থাকে না। আজ তাকে ডেকে কিছু ফুল নিলাম। একটা রক্ত গোলাপের কুঁড়ি পরলাম চুলে। আর কয়েকটি ফুল কাঁচের গ্লাসে সাজিয়ে রাখলাম। কেউ আমাকে বলে দেয়নি। 'শুধু সে আসবে আমার মন বলে'
কিন্তু বিকেল গেল, সন্ধ্যে গেল, রাত দশটা বেজে গেল। কেউ এল না।
মা বলল, 'আমি জানতাম। তোর মত বোকা দুনিয়ায় আর দুটি নেই।'
পরদিন আমি ভাবলাম সে হয়তো আমাকে খুঁজতে কালও সেই ক্লিনিকেই গিয়েছিল। বাড়িতে থেকে আমিই ভুল করেছি।
পরদিন আমিই খোঁজে বেরোলাম। একা একা গেলাম ওর সেই পার্ক স্ট্রীটের ফ্লাটে। গিয়ে দেখলাম তালা বন্ধ। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন যেন থেমে

যাওয়ার জো হল। আশে পাশের ঘরে যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে 'জানিনে।' এখানে সবাই যেন এক জোট বেঁধেছে।
আমার মুখ দেখে হিন্দুস্থানী দারোয়ানের দয়া হল। সে আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে বলল, 'মাইজী, পুলিসই ওকে কায়দা করতে পারল না, আর তুমি পারবে? ও এক আচ্ছা আদমী। কোথায় পালিয়েছে তার ঠিক কি! না পালিয়ে কি জো ছিল? এক মাস ধরে জুয়ায় কেবল হারছে। চারদিকে ধার দেনা। সবাইকে ফাঁকি দিয়েছে। আমার কাছ থেকে পঁচিশটা টাকা নিল, আর দিল না। তোমাকে কি বলেছিল?'
আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'কিছু বলেনি।'

দুটোয় ডিউটি আরম্ভ। তাড়াতাড়ি করে ক্লিনিকে এলাম। যদি সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। দেখি ম্যানেজার আর রানীদির মুখ ভার হয়ে রয়েছে। আমাকে দেখে ম্যানেজার ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। রাণীদি বলল, 'কাল কি হয়েছিল মুখপুড়ী? না বলে অমন কামাই করলি যে?'
আমি বললাম, 'মানুষের অসুখ-বিসুখ কি হতে নেই।'
রাণীদি আমার গাল টিপে দিয়ে বলল, 'তা হবে না, কেন? কিন্তু এ তোর অসুখের কামাই নয়, সুখের কামাই। মুখ দেখেই টের পাচ্ছি। চোখের কোলে কালি পড়েছে। খুব ফুর্তি লুটেছিস না?'
আমি খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম নীলাম্বর এখানেও আসেনি। রাণীদি বলল 'তুইও যেমন। ওরা ফুলে ফুলে মধু খায়। আজকের ফুল কাল ওদের কাছে বাসি। যদি একজনের কাছে চিরকাল থাকবে তাহলে ঘরের বউ কি দোষ করেছে?'
আগের দিন কামাই করবার জরিমানা হিসাবে সেদিন আমাকে দ্বিগুণ কাজ করতে হল। শুধু তাই নয়, এক ভুঁড়িওয়ালা কুদর্শন আধবুড়ো ব্যবসায়ীর গাড়িতে আমাকে তুলে দেওয়ার জন্যে জোরজবরদস্তি করতে লাগলেন ম্যানেজার। আমি অসুখের দোহাই দিয়ে কোনরকমে রেহাই পেলাম।
দিন দুই পরে ক্লিনিকের ঠিকানায় নীলাম্বরের চিঠি এল। তারিখ নেই, জায়গার নাম নেই, সম্বোধন নেই, স্বাক্ষর নেই। শুধু আছে, "ভেবে দেখলাম তোমার সঙ্গে আমার জীবনকে আর না জড়ানোই ভালো। কোন বন্ধন আমি মানিওনে, বিশ্বাসও করিনে। তাছাড়া তোমার আমার যে বন্ধন তা হবে

বজ্র আঁটুনি, ফসকা গেরো। তেমন গিঁট বাঁধতে গিয়ে লাভ নেই। আপাতত কলকাতা ছাড়ছি। তোমার ভয়ে নয় পুলিসের ভয়ে। তারা নাছোড়বান্দা হয়ে পিছু লেগেছে।" আমি টুকরো টুকরো করে সেচিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। তার সব মিথ্যে, সব ভুয়ো, সব ছলনা। ভদ্র-ভাষার আড়ালে সে তার শঠতাকে গোপন করেছে কাব্যের আড়ালে স্বভাবের সমস্ত কুশ্রীতাকে ঢেকে রেখেছে। হৃদয়কে পাথর দিয়ে গড়েছে সে। রানীদি কখন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে আমি টের পাইনি।

পিঠে আলগোছে হাত রাখবার পর আমি চমকে উঠে মুখ ফেরালাম।
রাণীদি বলল, 'কাঁদছিস কেন, কি হয়েছে?'
আমি বললাম, 'কিছু হয়নি।'

রাণীদি বলল, 'বোকা কোথাকার। কক্ষনো কাঁদবিনে। এ দুনিয়ায় চোখের জলের কোন দাম নেই। তুই তো মরতে মরতে বেচে গেছিস লতি। আমি একেবারে চিতের ঘাট থেকে উঠে এসেছি। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু ভিতরটা একেবারে অঙ্গার হয়ে গেছে।'
নিজের দুঃখ তখনকার মত ভুলে গিয়ে রানীদির দুঃখের কাহিনী শুনতে লাগলাম। তাকেও একজন ভালোবেসেছিল। বিয়ে করবে বলে এখান থেকে উদ্ধার করে ফ্লাটে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। মাস দুয়েক ঘর সংসারও চলেছিল। তারপর সব জানাজানি হয়ে যায়। রানীদির কুল-কুলজী কিছুই গোপন থাকে না। তার ভাবী স্বামীর বাপ-মা কেঁদে কেটে ভয় দেখিয়ে ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে যান। রানীদি আবার ফিরে আসে এই ক্লিনিকে। কিন্তু তখন তার বাচ্চা পেটে এসেছে। বিপদের অন্ত নেই। যারা আদর করত তারা উপহাস পরিহাস করে। কিন্তু ক্লিনিকের মালিক শেষ পর্যন্ত দয়াধর্ম করেছিলেন। কাঁটা খসাবার সব খরচ দিয়েছিলেন তিনি। দেহের কাঁটা গেছে। কিন্তু মনের কাঁটা এখনো মিলায়নি। তা সহস্রমুখ হয়ে এখনো মাঝে মাঝে বেঁধে।

তারপর থেকে ক্লিনিকে আমি অনিয়মিতভাবে যেতে লাগলাম। একদিন যাই তো আর একদিন যাইনে। সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। যে দেহের স্বাদ আর সৌরভে আমি এতদিন বিভোর হয়ে ছিলাম আজ দেখলাম তা মিথ্যে। সত্যিকারের ভালোবাসা ছাড়া

এই দেহের কোন দাম নেই? একদিনের ভোগ আর একদিনের বিতৃষ্ণার পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। লাল পাগড়ি পুলিস এসে হানা দিল আমাদের ক্লিনিকে। আমি মনে মনে খুব খুশি হলাম। আমার তো সব গেছেই। ওদেরও সব যাক। প্রতারণা প্রবঞ্চনার শোধ আমি কার ওপর দিয়ে তুলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এবার যেন তার পথ দেখতে পেলাম। পুলিশ যখন আমার জবানবন্দী চাইল আমি সব বলে দিলাম। কারো নাম গোপন করলাম না। কম্পাউণ্ডারের নাম, ম্যানেজারের নাম, নীলাম্বরের নাম, সব বললাম। এখানে যে যে কাণ্ডকারখানা হয় যে সব অনাচার অত্যাচার চলে কিছুই গোপন করলাম না।

ভাবলাম সবাইর হাতে এবার হাতকড়ি পড়বে। কিন্তু ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত মোটে গড়ালই না। থানা থেকেই সব মিটমাট হয়ে গেল। সব রুই কাতলা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। আমার সহকারিণীরা অভিশাপ দিতে লাগল তাদের অন্ন মারলাম বলে। আমি জানি কাজ তাদের যায়নি ক্লিনিকও বন্ধ হয়নি। নতুন নামে তা আবার চলেছে।

রানীদি বলল, 'নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলি লতি। শক্রর গোষ্ঠী বাড়ালি।'

আমি ভ্রূক্ষেপ করলাম না। আমার আর কে কী ক্ষতি করবে?

কিন্তু দেখলাম রানীদিই ঠিক কথা বলেছে।

একদিন রাত গোটা দশেকের সময় কারা এসে আমাদের বস্তির মধ্যে হানা দিল। আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। ভয়ে লজ্জায় আমি আর ঘর থেকে বেরোলাম না। কিন্তু শ্যামলালদা এল বেরিয়ে। সদর দরজা খুলে ওদের সামনে সে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা ভদ্দরলোকের বাড়ি। শুঁড়িখানা নয়। মাতলামির আর জায়গা পাওনি? বেরোও এখান থেকে।'

কে একজন বলল, 'কতবড় ভদ্দরলোক তা চেনা আছে। সতী সাধ্বী কুললক্ষ্মীকে সরমে ধরেছে। সেই ছেনাল ছুঁড়িটাকে ডেকে দাও। যত টাকা চায় দিচ্ছি। মদন মল্লিক মেয়েমানুষ জাতটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। তাদের কিনতে এসে টাকার হিসেব করে না।'

একথার জবাবে শ্যামলালদা ঠাস করে মল্লিকের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'বেরোও শূয়োরের বাচ্চা।' সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক চেঁচিয়ে উঠল, 'গেলাম গেলাম। মেরে ফেললে আমাকে।'

মল্লিক একা আসেনি। গাড়িতে দুজন বন্ধুকেও নিয়ে এসেছে। তারা এগিয়ে এল। শ্যামলালদার মাথায় পড়ল সোডার বোতলের বাড়ি। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। হৈ হল্লা চেঁচামেচি। সারা বস্তির লোক এসে জড়ো হল আমাদের দোরের সামনে। নানারকম শ্লেষ ব্যঙ্গ অশ্লীল মন্তব্য চলতে লাগল। মা কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল; 'এ সব কি কাণ্ড? এ কি ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

কে একজন পুলিশে খবর দিতে গেল। কিন্তু পুলিশ আসবার আগেই মল্লিক দলবল নিয়ে পালিয়ে গেল।

শ্যামলালদাকে হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে হল না। আমাদের কম্পাউণ্ডারই তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। ঘরে এসে বিছানা নিল শ্যামলালদা। যমুনা বউদি রইল মুখ ফিরিয়ে। সে জানে যত নষ্টের মূল আমি। আমার জন্তেই সকলের এই লাঞ্ছনা দুর্গতির সীমা নেই।

কেউ চাইছিল না তবু আমি সেই গভীর রাত্রে বসলাম গিয়ে শ্যামলালদার শিয়রের কাছে। তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, 'কেন আমার মত মেয়ের জন্তে আপনি ওদের সঙ্গে লড়তে গেলেন। আমি তো এত সম্মানের যোগ্য নই।'

শ্যামদা বলল, 'লতাদি আমি তোমাকে দিদি বলে ডেকেছি। তোমার মান আমি রাখব না তো কে রাখবে। তবে খালি হাতে বেরোন আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু সোডার বোতল চালাতে আমিও জানি। ওরা আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না একথা জেনে রেখো।'

শ্যামলালদার কাছে বেশিক্ষণ বসি, যমুনা বউদির তা ইচ্ছা ছিল না। তাই আমি খানিকক্ষণ পরেই উঠে এলাম। রাতও বেশ হয়ে গিয়েছিল।

সে রাত্রে আমার সঙ্গে মা আর কোন কথা বলল না। পরদিন ভোরে উঠে বলল, 'আমার নাম করে রাঁচীর শীতাংশু গাঙ্গুলীকে আজই একটা তার করে দিবি। লিখবি আমার খুব অসুখ; যদি দেখতে চায় দু'এক দিনের মধ্যে যেন চলে আসে।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। রাঁচীতে আমার বাবার এক পিসতুতো ভাই

পি, ডবলিউ. ডি তে বড় চাকরি করেন তা আমি শুনেছিলাম। কিন্তু বাবা কি মা কেউ তাঁর নাম করতেন না। তিনিও কোন খোঁজ খবর নিতেন না। ওঁদের মধ্যে গুরুতর রকমের কোন একটা বিরোধ ঘটেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সে বিরোধের বিবরণ কিছু আমি শুনিনি। ওঁরাও বলেননি। আজ এতকাল বাদে মা তাঁকে টেলিগ্রাম করছে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। যাঁর সঙ্গে ওঁরা ইচ্ছা করে সম্পর্ক ছেদ করেছেন আজ তাঁকে ডাকলেই কি তিনি আসবেন। কিন্তু মা আমার কোন উপদেশ পরামর্শ শুনল না। আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'আমি যা বলছি তাই করে আয়। কথা না শুনলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।'

পাড়ার পোষ্ট অফিস থেকে তার করে আসবার পর মা আমাকে সব কথা খুলে বলল। আমাকে তার আর এখানে রাখবার ইচ্ছা নেই। যে ভাবেই পারুক আমাকে সে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিতে চায়। আমি এখানে থাকলে মদন মল্লিকের দল আমাকে ছিঁড়ে খাবে। আমাদের বাড়িতে গুণ্ডাদের হামলা হবে রোজ সন্ধ্যায়। এই বস্তির লোকই এসে হয়ত হানা দেবে, বিচিত্র নেই কিছু। শেষ পর্যন্ত একটা খুনোখুনি কাণ্ড না ঘটে যাবে না। কালই তার সূত্রপাত হয়ে গেছে।

আমি বললাম 'আমাকে বাইরে পাঠালে তোমার চলবে কি করে?'

মা বলল, 'সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। যে ভাবে তুমি চালাচ্ছ তেমন ভাবে আর চালাতে চাইনে। তার চেয়ে অচল হয়ে যাবো সেই ভালো।'

একটু বাদে বলল, 'মান সম্মান তো সবই গেছে এখন প্রাণটুকু থাকলে বাঁচি।'

কার মান সম্মান কার প্রাণ আমার তা বুঝতে বাকি রইল না। মনে মনে ভাবলাম আমার মত মেয়ের প্রাণের জন্যেও মার প্রাণ কাঁদে!

শীতাংশু কাকা যে সত্যিই আসবেন এমন আশা আমার ছিল না। আমি শুধু মার খেয়াল মেটাবার জন্যই টেলিগ্রাম করেছিলাম। ভেবেছিলাম আমাদের অন্য আত্মীয় স্বজন যেমন মুখ ফিরিয়েছেন, কেউ কেউ চিঠির জবাব পর্যন্ত দেননি তিনিও তাই করবেন। কিন্তু দুদিন বাদে তিনি সত্যিই এলেন। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে লম্বা সুদর্শন এক ভদ্রলোক এসেছেন মার সঙ্গে দেখা করতে। চেহারা দেখে পঞ্চাশের নিচেই মনে হয় বয়স। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি। বেশ-বাসের চাকচিক্য নেই। তবু মুখ দেখেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি।

মা বলল, 'তোর নতুন কাকা। প্রণাম কর লতা।'
আমি নিচু হয়ে পায়ের ধূলো নিতে যেতে তিনি একটু বাধা দিয়ে বললেন, 'মেয়েতো একেবারে লক্ষ্মীঠাকরুণের মত হয়েছে বউদি। তোমার সেকালের চেহারার কথা মনে পড়ে।'
মা লজ্জিত হয়ে বলল, 'সে পুরোণ কথা ছেড়ে দাও নতুন ঠাকুরপো।'
কাকা হেসে বললেন, 'আর নতুন ঠাকুরপো! এখন আমিও পুরোণ ঠাকুরপো হয়ে পড়েছি বউদি। নতুন যুগের ছেলেমেয়েরা আমাদের তো কেয়ারই করে না। নেহাৎই চেহারাটা মজবুত আছে তাই বুড়ো হাবড়া বলে ডাকে না। দুদিন বাদে তাও বলবে।'
দেওর বউদিকে বহুদিন বাদে রঙ্গরসিকতা আর সুখ দুঃখের আলাপ করবার সুযোগ দিয়ে আমি চলে এলাম চা আর খাবারের আয়োজনে। খানিক বাদে প্লেটে করে খানিকটা হালুয়া নিয়ে ঘরে ঢুকছি নতুন কাকার গলা কানে এল।
আমি দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লাম।
নতুন কাকা মৃদুস্বরে কিন্তু বেশ আবেগের সঙ্গে বলছিলেন, 'আমার প্রথম যৌবনের সেই অপরাধ তুমিও ক্ষমা করতে পারনি, দাদাও ক্ষমা করতে পারেনি। আমি নিজেকেও নিজে ক্ষমা করিনি বউদি। বারবার ইচ্ছা হওয়া সত্বেও তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি। ভেবেছিলাম না ডাকলে আর তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াব না। কিন্তু আমার সেই অপরাধের একি কঠিন শাস্তিই না দিলে বউদি। দাদা তো গেছেই তুমিও যেতে বসেছ। একি দশা হয়েছে শরীরের।' মা বলল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার এখন যেতে পারলেই শাস্তি। কিন্তু মেয়েটাকে তুমি বাঁচাও নতুন ঠাকুরপো।'
কাকা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন মেয়ের কি হয়েছে ?'
মা ঢোঁক গিলে বলল, 'কিছু হয়নি। কিন্তু আমি ছাড়া তো ওর কেউ নেই, আমি চোখ বুজলে ওর কী গতি হবে ? তোমারও তো মেয়ে নেই। তুমি যদি ওর ভার নাও আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।'
কাকা বললেন, 'দেখ, মরা মরা কোরো না। বাঁচবার কথা ছাড়া আমি আর কোন কথা শুনতে রাজী নই।'
চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল আমি দেরি না করে ঘরে ঢুকলাম। কাকা মাকে

রাঁচীতে যাওয়ার জন্তে অনুরোধ করলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত মাকে যাদবপুর হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে কাকা আমাকে নিয়ে রাঁচী রওনা হলেন। মার যা শরীরের অবস্থা তাতে তাঁর কাছ ছাড়া হতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মার ইচ্ছা সম্পূর্ণ বিপরীত। সে আমাকে কিছুতেই আর কলকাতায় রাখতে রাজী নয়।

বিদায় নেওয়ার সময় সেও কাঁদল, আমিও কাঁদলাম। সে বলল, 'আমার জন্তে ভাবিসনে। তুই নিজে সাবধানে থাকিস, ভালো হয়ে থাকিস, তা হলেই আমি শান্তি পাব।'

আমি চাইনি এখানকার কেউ আমাদের সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত যাক। কিন্তু শ্যামলালদা কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ল না। সে হাওড়া ষ্টেশন পর্যন্ত গেল। কাকা তাঁর একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে সে আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, 'লতাদি, কোথায় যাচ্ছ বলে যাবে না?' আমি একটু ইতস্তত করে কাকার নাম ঠিকানাটা ওকে দিলাম। যে আমার জন্তে এতখানি করেছে তাকে অবিশ্বাস করতে মন সরল না।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ল। শ্যাম-লালদাকে তো কিছু দিয়ে আসা হল না। কাকার কাছ থেকে কিছু চাইতে আমার সংকোচ হচ্ছিল। অথচ ওর ঘরে আমারই মত কালকের দিনের সংস্থান নেই তাতো আমি জানি। মাথার ঘা এখনো শুকায়নি। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ব্যাণ্ডেজটা এখনো দেখা যাচ্ছে।

কাকা আমার কাছে এসে বললেন, 'লোকটি কে। বেশ একখানা দশাসই চেহারা তো।'

আমি অন্যমনস্কের মত বললাম, 'হুঁ।'

কলকাতা থেকে রাঁচী নয়, এ যেন একজগৎ থেকে আর এক জগতে চলে এলাম। কলকাতা জায়গা হিসাবে অনেক বড়। লোকসংখ্যা আর বৈচিত্র্যও রাঁচীর সঙ্গে তুলনা হয় না। কিন্তু আমার কলকাতার আয়তন কতটুকুই বা ছিল। মাণিকতলার সেই ঘিঞ্জি বস্তি আর ধর্মতলার ক্লিনিকের সেই তৈল পিচ্ছিল গহ্বর। এই দুখানি ঘরের মধ্যে অত বড় সহরটা আমার বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। তার তুলনায় এই পাহাড়ী সহর রাঁচী অনেক ফাঁকা আর নির্জন। লালপুরের এদিকটা আরো বেশি শান্ত আর

নিস্তব্ধ। নতুন কাকা যে কোয়ার্টার পেয়েছেন তাও যথেষ্ট বড়। এত বড় বাড়িতে ওঁদের দরকার নেই; ঝি চাকর ছাড়া ওঁরা তিনটি মাত্র মানুষ। কাকা কাকীমা আর ওঁদের ছেলে সঞ্জয়। সঞ্জয়দা রাঁচী কলেজে প্রফেসারি করেন। এখনো বিয়ে করেননি। কাকিমা তার জন্যে প্রায়ই তাগিদ দিচ্ছেন। বাপ মার তুলনায় ছেলে একটু বেশি গম্ভীর, কম মিশুক। তা সত্বেও তিনজনেই আমাকে প্রায় সমান প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আমি আমার থাকবার জন্যে আলাদা ঘর পেলাম। একজনের বাস করবার পক্ষে ঘরখানা বেশ বড়ই বলতে হবে। আমাদের সেই বস্তির ঘরের প্রায় দ্বিগুণ। বড় বড় জানালা দরজা। আলো হাওয়ার অভাব নেই। কাকা আর কাকীমা দুজনেই খেতে আর খাওয়াতে ভালবাসেন। চারবেলায় ওঁরা যা খাবারের ব্যবস্থা করেন তা রাজভোগের তুল্য। কোন দিক থেকে আমার কোন অভাব নেই, অস্বাচ্ছন্দ্য নেই। ঝি-চাকর আছে আমাকে নিজের হাতে প্রায় কিছুই করতে হয় না। যেটুকু করতে হয় তা সৌখিন কাজ মাত্র। চা করা আসবাব পত্র একটু গুছিয়ে রাখা, বইয়ের আলমারিগুলি সাজানো এই সব। কাকার যেমন অবসর সময় পাড়াপড়শীদের ডেকে এনে গল্প করা হৈ চৈ করা স্বভাব কাকীমার তেমনি অভ্যাস বই পড়া। যত রাজ্যের গল্প উপন্যাস কিনে কিনে তিনি এক লাইব্রেরী করে ফেলেছেন। কাকা ঠাট্টা করে বলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

আমার কোন অসুবিধা অভাব নেই। আর কোন অভিযোগ নেই কারোর কাছে। তবু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও মনে হয় জীবনটা যেন বড় শূন্য হয়ে গেছে। আর প্রায়ই মার কথা মনে পড়ে। ইদানীং মার সঙ্গে তো আমার বেশির ভাগ ঝগড়াই হত। মা কথাটার মানে ছিল আমার কাছে শুধু গেঁয়ো কুশ্রী গালাগালি, অকারণ অভিমান আর স্বার্থপরতা। এখন সেই মার জন্যই আমার মন ছটফট করত লাগল।

কাকীমা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন 'মার জন্য মন পোড়ে বুঝি? কিন্তু তুমি তো অবুঝ মেয়ে নও। মন খারাপ করবার কি আছে? ভালো হাসপাতালে, ভালো ডাক্তারদের চিকিৎসায় রয়েছেন। নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন।'

কাকীমার শেষ কথাটা তেমন জোরালো শোনালো না। আমি এখানে এসে

সপ্তাহে মাকে একখানা করে চিঠি লিখতাম। তাঁর কাছ থেকে জবাব অবশ্য তত নিয়মিত পেতাম না। তাঁর সব চিঠিতে একই কথা লেখা থাকত, 'আমি ভালো আছি, আমার জন্যে কোন চিন্তা কোরো না।'
তারপর সেই অনিয়মিত চিঠি আসাটাও একদিন বন্ধ হয়ে গেল। মাস তিনেক বাদে কাকার নামে চিঠির বদলে মার মৃত্যু সংবাদ বয়ে নিয়ে টেলিগ্রাম এল। আমি ওঁদের সামনে গলা ছেড়ে কাঁদতে পারলাম না। শুধু বসে রইলাম। আর সেই বোবা কান্না দুর্বার আবেগে আমার বুকের ভিতরটা যেন ভেঙেচুরে ফেলতে লাগল।
কাকা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন 'আমরা চিরদিন কেউ বেঁচে থাকতে আসিনি লতা। সবাইকে একদিন না একদিন এভাবে চলে যেতে হবে।'
কাকীমা বললেন, 'এক হিসাবে তিনি ভালই গেছেন। যে যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন তার হাত থেকে তো মুক্তি পেয়েছেন।'
ওঁদের সামনে না কাঁদলেও ঘরে এসে নিজেকে আর আমি সামলাতে পারলাম না। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে বললাম, 'মা, মাগো।'
আমার কেবলই মনে হতে লাগল যাঁর জন্যে আমি এত করলাম এত ছাড়লাম তাকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারলাম না; আমার সব বৃথা, সব পণ্ডশ্রম হয়ে গেল। কাকা এসে আস্তে আস্তে পিঠে হাত রাখলেন। ধরা গলায় বললেন, 'কাঁদিসনে।'
আমি বললাম, 'কাকা, আমি কলকাতায় যাব মাকে দেখতে।' কাকা বিরক্ত ভাবে কাকীমাকে ডেকে বললেন, 'ওগো শুনছ? লতা কলকাতায় যেতে চাইছে। ওর মাকে দেখতে চায়।' কাকীমার বাস্তববোধ অনেক বেশি। তিনি স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমিও যেমন পাগল লতাও তেমনি। এখন গিয়ে কী দেখবে ও? যে যাবার সে তো চলেই গেছে। এখন গিয়ে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে রমেনকে টেলিগ্রাম করে দাও তারা গিয়ে যেন সৎকারের ব্যবস্থা করে। জিনিষপত্র যা আছে তাদের কাছে নিয়ে রাখে। পরে আনিয়ে নিলেই হবে।'
রমেনবাবু কাকীমার ছোট ভাই। বালীগঞ্জে থাকেন। ওখান থেকে তো যাদবপুর কাছেই। সেই ব্যবস্থাই হল। আমাকে ওঁরা মার শেষ চিহ্ন দেখতে দিলেন না। ওঁদের সমস্ত মায়া মমতা সহৃদয়তার মধ্যেও এই নিষ্ঠুরতার কথা আমার দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মনে ছিল।

প্রথম প্রথম আমি রোজ রাত্রে মাকে স্বপ্ন দেখতাম। কখনো দেখতাম ক্লিনিকে যেতে মা আমাকে বাধা দিচ্ছেন নানা ধরণের গালাগালি করছেন। কখনো বা আমার মাথার চুল বাঁধতে বসেছেন, 'ইস এ যে একেবারে জট বেঁধে গেছে। তোরই বা দোষ কি! ছুদিন ধরে তো ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই।'

কোনদিন দেখতাম আমরা ছুজনে একসঙ্গে কোথায় যেন যাচ্ছি। অচেনা জায়গা, অচেনা পথ অচেনা সব গাছপালা কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর। কোন সুখ স্বপ্ন শেষটা দেখা যায় না। আমারো রাত ভোর হবার আগেই স্বপ্ন ভেঙে যেত। ঘুম ভাঙবার পর আবার নতুন বেদনার ভিতর দিয়ে অনুভব করতাম মা নেই।

তারপর আস্তে আস্তে শোকের বেগ কমল। স্বপ্নের পরিমাণও কমে আসতে লাগল যা দেখি তাও সব মনে থাকে না।

মায়ের শোক ভোলবার জন্যে কাকাও আমাকে নিয়ে রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াতে আরম্ভ করলেন। রাঁচীতে তো বেড়াবার জায়গার অভাব নেই। কাকীমা বেড়াতে ভালবাসেন না। তাছাড়া সকালের দিকে তাঁর কিছু সংসারের কাজকর্ম থাকে, ঠাকুর চাকরকে নির্দেশ উপদেশ দিতে হয়। ঠাকুর একজন নাম মাত্র আছে, কিন্তু রাঁধেন কাকীমা নিজেই। কাকাও তাতে খুসি। তিনি খাইয়ে মানুষ। তিনি বলেন, 'পুরুষ মানুষের হাতের রান্না খেয়ে কোন সুখ নেই। রান্নাটা মেয়েদের নিজস্ব ব্যাপার। পুরুষের কাছে ওটা পরধর্ম।'

সঞ্জয়দা বলেন, 'তাহলে ঠাকুরকে ছাড়িয়ে দিলেই হয়। ও যদি নাই রাঁধবে তাহলে ওকে আর রাখা কেন?'

কিন্তু নন্দকে ছাড়িয়ে দিতেও কাকার মন সরে না। অনেক দিন ধরে আছে। থাক।

কাকীমাকে সঙ্গ দিতে হয় দুপুরে। খাওয়া দাওয়ার পর কাকা আর সঞ্জয়দা কাজে বেরিয়ে গেলে কাকীমাকে আমি গল্পের বই পড়ে শোনাই। তারপর সেই বই নিয়ে আলোচনা করি।

সঞ্জয়দা একদিন বললেন, 'বসে বসে শুধু বই পড়ছ। তার চেয়ে একটু সিসটেমেটিক্যাল পড়াশুনা করলে স্কুল ফাইনালটা পাশ করতে পারতে।'

আমার বিদ্যা যে স্কুলের গণ্ডী পেরোয়নি তা সঞ্জয়দা আমার কাছে আগেই

শুনেছিলেন। তার প্রস্তাবে আমি খুব খুসি হয়ে উঠলাম। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আকস্মিকভাবে পড়াশুনোর আমার ছেদ পড়েছিল। এ জীবনে আবার যে ফের তা আরম্ভ করতে পারব তেমন আশা আর করিনি। সুযোগ পাওয়া মাত্র আমি তা নিতে আর দ্বিধা করলাম না।

সঞ্জয়দাকে বললাম, 'আপনি যদি আমাকে একটু দেখিয়ে টেখিয়ে দেন তাহলে পড়ি।'

তিনি বললেন, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। মাষ্টার বাড়িতে বসে থাকলেও নিস্তার পায় না। দেখতো ছেলেগুলি কি ভাবে এসে জ্বালায়। তুমি যদি সত্যিই পড়তে চাও কোচিং-এর কোন অভাব হবে না।'

সঞ্জয়দা কথা রাখলেন। কলেজের কাজ এন সি. সি. বাহিনীর সর্দারি এসব সত্বেও পুরো দুটো বছর তিনি আমার পিছনে খাটলেন। পরীক্ষা দিয়ে আমি ভেবেছিলাম কোন রকমে উতরে যাব। কিন্তু ফার্ষ্ট ডিভিসনের তালিকায় নিজের নাম দেখতে পেয়ে নিজেই অবাক হলাম।

কাকার আনন্দটা সবচেয়ে বেশি। তিনি বললেন, 'এই উপলক্ষে একটা ফিষ্ট দিই।'

অবশ্য ফিষ্ট তাঁর বাড়িতে লেগেই ছিল। তার জন্যে কোন উপলক্ষ দরকার হত না। প্রতিবারই কিছু না কিছু বন্ধুবান্ধবকে তিনি নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। ইংরেজী আর বাংলা নববর্ষে কি সঞ্জয়দার জন্মদিনে নিমন্ত্রিতের সংখ্যায় বাড়ি ভরে যেত। কিন্তু আমার পাশ করাকে উপলক্ষ করে লোকজন খাওয়াবার কথা শুনে আমি বড় লজ্জিত হলাম। কাকাকে বললাম, 'একে তো এই বুড়ো বয়সে পাশ করেছি। তারপর যদি এই নিয়ে অমন হৈ চৈ করেন লোকে হাসবে যে নতুনকাকা।'

কাকা বললেন, 'হাসে তো হাসুক। তাই বলে আমি আনন্দ আহ্লাদ বন্ধ করে দেব নাকি? তাছাড়া এমনই বা কি বেশি বয়স হয়েছে তোর। আমাদের সময় ছেলেরা যখন ম্যাট্রিক পাশ করত তখন তাদের দু' গালে চাপ দাড়ি গজিয়ে যেত। আর তুই তো মেয়ে তোর বয়সের কথা তো ওঠেই না।'

কাকা আর এক দফা নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা না করে সত্যিই ছাড়লেন না।

এঁদের ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে আমার এই ধারণাই জন্মে গেল, যেন আমার এই রাঁচী সহরেই প্রথম জীবন আরম্ভ হয়েছে। আমার আগেকার অভিজ্ঞতাগুলি

কিছুই না। সেগুলি যেন রাত্রির দুঃস্বপ্ন মাত্র। আমার ভাবতে ভাল লাগত আমি সত্যিই কুমারী রয়েছি। কোন কুশ্রীতা কোন কলঙ্ক যেন আমাকে স্পর্শ করেনি। আমি ভাবতাম বাকি জীবনটা এইভাবে কেটে যাবে। কাকা কাকীমা আর সন্নরদার সেবা শুশ্রূষা করব আর ওঁরা আমাকে ভালবাসবেন। জীবনে এর চেয়ে বেশি কি প্রয়োজন আছে। নীলাম্বরের কথা মাঝে মাঝে যে মনে না পড়ত তা নয়। মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা দুঃসহ জ্বালা বোধ করতাম। তার শঠতা আর প্রতারণার কথা ভুলতে পারতাম না।

কিন্তু কাকা আর কাকীমা এর মধ্যে বিয়ের কথা পাড়তে শুরু করলেন। গরজটা কাকীমারই বেশি। একদিন আড়াল থেকে তাঁদের আলাপ আমার কানে গেল।

কাকীমা বলছেন, 'পরের মেয়ের দায়িত্ব তো নিয়েছ, এখন হাত পা কোলে করে বসে থাকলে চলবে কেন? বিয়ে টিয়ের চেষ্টা দেখ।'

কাকা বললেন, 'এত ব্যস্ত হবার কি হয়েছে?'

কাকীমা বললেন, 'শোন কথা। ওর বয়স কি কম হয়েছে নাকি। বাইশ তেইশ তো হবেই। এর পর বিয়ে দেবে কি বুড়ো হয়ে গেলে? ভজু উকীলের স্ত্রী সেদিন ঠাট্টা করে বলছিলেন, মেয়ের কি বিয়ে দেবে দিদি, নাকি নিজেরাই রেখে দেবে? ভারি বিশ্রী মুখ যাই বল। আমি ছাড়িনি বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি।'

কাকা একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা সম্বন্ধ টম্বন্ধ দেখ তা'হলে। কজন আমাকে বলেওছে। কিন্তু আমার মন এগোয় না। ওর ছেলেবেলাটা তো খুব কষ্টে কেটেছে। বিয়ে দিলে এমন ঘরে দেব যাতে ছেলেটি বেশ ভালো হয় আর খাওয়া পরারও কোন অভাব না থাকে।'

কাকীমা বললেন, 'মেয়ের বাপ নেই, মা নেই, খুব ভালো সম্বন্ধ কি করে আশা কর তুমি?' কাকা বললেন, 'আহা আমরা তো আছি। যারা এগোবে আমাদের দেখেই এগোবে। তাছাড়া আমাদের লতাও তো থেঁদি-বুঁচি নয় রূপে গুণে লক্ষ্মী। আমার তো মনে হয় এখানকার বাঙালীদের অমন মেয়ে দুটি নেই।'

বিয়ের কথা শুনে আমার এক ধরণের আতঙ্ক হল। না না, আমি কোন সুখ সৌভাগ্য চাইনি আর কোথাও যেতেও চাইনে। যা পেয়েছি তাই আমার যথেষ্ট।

লজ্জা সংকোচ কাটিয়ে একদিন পান সাজতে সাজতে কাকীমাকে কথাটা বললাম, 'কাকীমা আমি কিন্তু বিয়ে করব না। আমার জন্যে সম্বন্ধ-টম্বন্ধ কিছু দেখবেন না।' কাকীমা বললেন, 'দাদার বুলি ধরেছ দেখছি। খোকাও বলে বিয়ে করবে না, আবার তুমিও বলছ বিয়ে করব না। দেশসুদ্ধ লোক সন্ন্যাসী হয়ে থাকলে সংসার সমাজ চলবে কি করে?'

বললাম, 'সঞ্জয়দাকে বলুন, তিনি বিয়ে করবেন। তাঁর তো আর বিয়ে করতে কোন বাধা নেই।'

কাকীমা বললেন, 'তোমারই বা কিসের বাধা।'

আমি মুখ নিচু করে বললাম, 'আমার ইচ্ছা আমি আপনাদের সেবাযত্ন করি।'

কাকীমা বললেন, 'সে তো আর চিরকাল হবার নয় বাছা। আমরা তো কেউ আর অমর বর নিয়ে আসিনি, একদিন আমাদেরও চলে যেতে হবে তখন তোমার গতি কি হবে? তাছাড়া স্বামীর ঘরই মেয়েদের আসল ঘর। স্থায়ী আশ্রয়। স্বামী পুত্রই যদি না হল নারীজন্ম নিয়ে লাভ হল কি?'

কিছুদিনের জন্যে কথাটা চাপা পড়ল। কিন্তু ফের উঠল নতুন সূত্র নিয়ে।

সেদিন সকালে কাকা গিয়েছিলেন ষ্টেশনের দিকে বেড়াতে। কাকীমার সঙ্গে আমি বসে বসে তরকারি কুটছিলাম। হঠাৎ কাকার গলা শুনে কান খাড়া করলাম। তিনি প্রায় সোরগোল তুলে বাড়িতে ঢুকলেন, 'ও খোকা ও লতু দেখ এসে কাকে নিয়ে এসেছি। আমাদের সুবু এসেছে, সুবু।' কাকীমা তাড়াতাড়ি কুটনো ফেলে রেখে উঠে গেলেন। তারপর সাদর আহ্বানে বললেন, 'সুব্রত? এসো এসো, তুমি তো এপথ ভুলেই গেছ বাবা।' স্নিগ্ধ সুমিষ্ট গলার জবাব শুনলাম, 'ভুলিনি কাকীমা। আজকাল কলকাতার বাইরে বড় একটা আসাই হয় না। এত কাজের চাপ পড়েছে অফিসে।' বলতে বলতে ভিতরের দিকে এসেই ভদ্রলোক হঠাৎ আমাকে দেখে থমকে গেলেন। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলেন কাকীমা বললেন, 'পালাচ্ছ কেন? ও আমাদের ভাসুরঝি লতা। আর সুব্রত ওঁর বন্ধুর ছেলে।'

সুব্রতবাবু বললেন, 'শুধু বন্ধুর ছেলে কেন মাসিমা, ছেলেরও তো বন্ধু। আমাদের পারিবারিক বন্ধুত্ব দুই পুরুষে পড়ল। কিন্তু সঞ্জয় একটি আস্ত সিনিক। ও বন্ধুত্বে টন্ধুত্বে বিশ্বাস করে না।'

সঞ্জয়দা প্রতিবাদ করতে করতে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'পাষণ্ড, তুমি

যেন কত বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছ। তাইতো ছ'মাসের মধ্যেও একবার খোঁজ নাও না। চিঠি দিলে জবাব দিতে চাও না।'

সুব্রতবাবু দেখলাম বেশ একটু লাজুক। বন্ধুর অভিযোগের ঠিক মতো জবাব দিতে পারলেন না। শুধু মৃদু হেসে বললেন, 'চল হে চল, চল তোমার ডেরায় চল। ঝগড়াটা সেখানে গিয়েই করা যাবে।'

ঘণ্টা তিনেক দুই বন্ধুতে মিলে গল্প গুজব চলল। কাকীমার অনুরোধে আমিই খাবার আর চা জোগালাম। গোড়াতে আমি আপত্তি করেছিলাম। 'কাকীমা বললেন, 'সে কি হয়? আমার হাত আটকা, সুব্রত ঘরের ছেলের মত। ওকে কি চাকরের হাতে খাবার পাঠানো যায়!'

তাই আমাকেই যেতে হল।

সুব্রতবাবু আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। পুরুষের সে দৃষ্টির মুগ্ধতা আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু এ দৃষ্টির মধ্যে আবিলতা নেই। তার মধ্যে নির্মলতা, পবিত্রতার ভাবই বেশি। তিনি আবার তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে সঞ্জয়দা একটু হেসে বললেন, 'বোস না লতা, আমাদের তর্কের ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ আমাদের সেই পুরোন optimism আর pessimism এর ঝগড়া। মানে সুখবাদ আর দুঃখবাদ।' আমি বললাম, 'আমাকে বাদ দিন সঞ্জয়দা। আমি ওসব তর্কের কি বুঝি।'

বলে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। আসতে আসতে শুনলাম সুব্রতবাবু বলছেন, 'আমি চিরকালের optimist সঞ্জয়। ইদানিং আমার সেই optimism আরো বেড়েছে।' এর জবাবে সঞ্জয়দা হো হো করে হেসে উঠলেন, 'তাই নাকি সুব্রত বেশ বেশ। শুনে সুখী হলাম।' এসব কথা কাকে লক্ষ্য করে তা আমার বুঝতে দেরি হল না। আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। কিন্তু বুকের ভিতরের তোলপাড় চাপতে পারলাম না।

তারপর দুই বন্ধুতে শহর টহল দিতে বেরুলেন। সুব্রতবাবুর পূর্ণ পরিচয় পেলাম কাকা কাকীমার কাছে। জলপাইগুড়িতে একবার ওঁরা পাশাপাশি বাসায় ছিলেন। সুব্রতবাবুর বাবা সদানন্দবাবু ফরেষ্ট অফিসার। আর কাকা ইঞ্জিনিয়ার। প্রথমে পড়শিত্ব। সেই বন্ধুত্ব ছেলেদের মধ্যেও সঞ্চারিত হল। সঞ্জয়দা আর সুব্রতবাবু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এক সাথে আই এস, সি, পড়েছিলেন। কিন্তু সায়েন্স সঞ্জয়দার পোষালনা। তিনি

কাকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বি. এ., এম. এ-ই পড়লেন। তাতেও ভালো করতে পারলেন না। সেকেণ্ডে ক্লাস পেলেন ফিলজফিতে। আর কোথাও চাকরি বাকরির সুবিধে করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বাবার ধমক খেতে খেতে রাঁচিতেই ফিরে আসতে হল। ওঁর দুঃখবাদের মূল কারণ এই। বিয়ে করার কথায়ও এই জন্যই আপত্তি করেন। বলেন, 'নিজেই ভালো করে দাঁড়াতে পারলাম না, আর বিয়ে।'

কিন্তু সঞ্জয়দার বন্ধুর জীবনের গতি আলাদা হয়ে গেছে। তিনি শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে নিজেই এক ফার্ম খুলেছেন। কাজকর্ম ভালোই চলছে। ঢাকুরিয়ায় নিজেরা বাড়ি তুলেছেন। ওঁর বাবা এতদিন বন বিভাগের চাকরিতে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। এখন অবসর নিয়ে বাড়ি আর বাগান সাজানোর কাজে মন দিয়েছেন। কাকা আমার কাছে সুব্রতবাবুর খুব প্রশংসা করতে লাগলেন, 'খুব বুদ্ধিমান আর কর্মঠ ছেলে বুঝেছিস লতা। আর আমার পরামর্শেই ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায়। And now he has become a successful man।"

সুব্রতবাবু আরো দুদিন রইলেন। নানা উপলক্ষে বারবার আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হতে লাগল। মনে হল বাক্য বিনিময়ের জন্যেও তিনি উৎসুক। কিন্তু আমি ওদিক দিয়ে গেলাম না। যতটা পারি এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। আমি তো জানি আমি কি। আমি তো জানি সুদর্শন রুচিবান পুরুষের অনুরাগের পাত্রী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।

কিন্তু এড়িয়ে বেশিদূর থাকতে পারলাম না। সঞ্জয়দা প্রথম থেকেই আমার পিছনে লেগেছেন। তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন, 'চল সুবু আমরা হুড্রো ফল্‌স দেখে আসি। অনেকদিন যাইনি ওদিকে।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'লতা তুমিও চল। তোমারও তো দেখা হয়নি।'

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন সঞ্জয়দা। যত দুঃখবাদের তত্ত্বই আওড়ান যৌবনের রঙ আর রঙ্গ যাবে কোথায়।

আমি প্রবল আপত্তি করে বললাম, 'না না আপনারা যান, আমার যাওয়া হবে না।' কিন্তু কাকা আর কাকীমা সঞ্জয়দার পক্ষ নিলেন। আমি কিছুতেই ওঁদের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। ভিতরে ভিতরে আমার যাওয়ার ইচ্ছাও হয়ত ছিল। সঞ্জয়দা ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি না গেলে আমাদের চা টা জোগাবে কে? তুমি না গেলে আমিও পাদমেকং ন গচ্ছামি।'

শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারলাম না।
ঝরণা দেখে, ঝরণায় নেয়ে, ঝরণার ধারে পিকনিক করে সারাটা দিন আমরা কাটালাম। আমাদের মত আরো অনেকগুলি ছোট ছোট দলে জায়গাটা ভর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই আমরা পরিপূর্ণ আর কারো কাছে যাবার আর কাউকে ডাকবার আমাদের প্রয়োজন নেই। ঝরণা যেন ছুটি ঝরণায় বিভক্ত হয়ে ছুই পুরোন বন্ধুর মনে ঢুকে পড়েছে। ওঁদের উচ্ছলতা দেখে আমার তাই মনে হল। যেন ছুজনেই কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। সেই উচ্ছলতা আমারও মনে সংক্রামিত হল। আমার অনিচ্ছায় আমার অজান্তে। আমি তা চাইলাম না তবু আমার চাল চলন,আমার কথা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে লাগল।
ইতিমধ্যে সঞ্জয়দা এক কাণ্ড করলেন। আমাদের ছুজনকে একা রেখে কিছুক্ষণের জন্য কোথায় যেন অদৃশ্য হলেন। তাঁর দুষ্টুমি আমরা ছুজনেই বেশ বুঝতে পারলাম।
কিন্তু সুযোগ দিলে কি হবে, সুব্রতবাবু দেখলাম বেশ মুখচোরা মানুষ। নিশ্চয়ই অনেক কথা ওঁর বলবার ছিল। কিন্তু বলি বলি করেও একটি ছুটির বেশি কথা বলতে পারলেন না। তিনি বললেন; 'জায়গাটা বেশ ভাল তাই না?'
আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'
তিনি বললেন, 'এর আগে আপনি কোন ঝরণা দেখেছেন?'
আমি বললাম, 'না।'
আমার সংক্ষিপ্ত জবাবে তিনি বোধ হয় আলোচনাকে আর বিস্তৃত করবার ভরসা পেলেন না।
একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনাকে ঠিক সঞ্জয়ের বোন বলে মনে হয়।'
বললাম, 'কেন?'
তিনি বললেন, 'আপনিও ঠিক ওর মত অকারণ ছুঃখবাদিনী।'
আশ্চর্য আমার কথা তিনি অমন করে টের পেলেন কি করে! ঠিক সেই মুহূর্তে আমি বলতে পারতাম, আমার ছুঃখটা অকারণ নয়। কিন্তু কিছুই আমি বলতে পারলাম না। আমার মনে হল এই মনোরম

পরিবেশ, হেমন্তের শান্ত সুন্দর গোধূলি, এই পবিত্র ঝরণার ধারা এর কিছুই সেই কুশ্রী কলঙ্ক কাহিনীর বর্ণনার অনুকূল নয়। আত্মপ্রকাশের সেই প্রথম সুবর্ণ সুযোগ আমি হারালাম। আমার মনে হল আর ফিরে না যাওয়াই ভালো। যদি এই ঝরণার জলে নিজেকে নিঃশেষ করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম তাহলেই যেন ভালো ছিল। তাহলে এমন একটি সুন্দর পবিত্র সন্ধ্যা ওর স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকত।
কিন্তু কিছুই হল না। শত চেষ্টা করেও মুখ খুলতে পারলাম না। তাঁর কাছে এত অল্প পরিচয়ে কি কিছু বলা যায়। খানিক বাদে সঞ্জয়দা এসে হাঁক দিলেন।' 'কি হে, আজ কি উঠবে তোমরা? না কি এখানেই রাত্রিবাসের মতলব করেছ।'
সুব্রতদা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না না, 'চল এবার।'

কলকাতায় ফিরে গিয়ে সুব্রতবাবু দু লাইনে একখানা পৌঁছান সংবাদ দিলেন। তিনি যেমন মিতভাষী, চিঠিতেও তেমনি মিতাচারী। তাঁর বোন রঞ্জনা লিখল তার দাদার মনের কথা। সে সঞ্জয়দার কাছে লিখল, 'কোত্থেকে আপনার এক বোনকে আমদানী করলেন সঞ্জয়দা, আমার দাদার মাথা ধরার ব্যাধি ছিল না, এবার হল। আমরা সবাই বড় ভাবিত হচ্ছি তাকে কাঁকেতে না পাঠাতে হয়।'
কাঁকে মানে কাঁকের পাগলা গারদ।
কাকীমার কাছে সহজ ভাষায় লিখেছে আমাকে দেখে সুব্রতবাবুর খুব পছন্দ হয়েছে। আর সে কথা শুনে তার বাবা মাও খুশি। কারণ সুব্রতবাবু বিয়ে না করার অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসেছিলেন। কাকীমা যেন অবিলম্বে কনের একখানা ফটো, আর তার ঠিকুজীর নকল পাঠিয়ে দেন।
কাকীমা ফটো পাঠালেন। কিন্তু ঠিকুজীর নকল পাঠাতে পারলেন না। আমার ঠিকুজী-মিকুজী কিছুই নেই। কাকীমা লিখলেন ঠিকুজী তিনি করিয়ে নিয়ে পরে পাঠাবেন। সেই সঙ্গে লিখলেন, 'এ সম্বন্ধের প্রস্তাবে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি। সুব্রতের মত স্বামী যদি পায় সে তো লতার পরম ভাগ্য। আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করবার ইচ্ছা আমাদের অনেকদিন ধরেই ছিল। ভগবান এতদিন বাদে সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। শেষ রক্ষা করবার ভারও তাঁর। তবে মেয়ে দরিদ্রের ঘরে

মানুষ, বাবা মা নেই, একথা আগেই জানিয়ে রাখি।'
মুসাবিদা কাকাই করে দিলেন অবশ্য। কিছুদিন ধরে এই ধরণের পত্র বিনিময় চলল। তারপর সদানন্দ বাবু এসে একগাছা হার দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'এমন লক্ষ্মীশ্রী আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। সুবুর জন্যে কত মেয়েই তো কত জায়গায় দেখলাম।' জ্যোতিষীও স্বপক্ষে রায় দিলেন। ঠিকুজীর রাশি নক্ষত্র একেবারে ঠিকঠাক মিলে গেল।

দেখা শুনা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ হল না। তার সুযোগই দিলেন না কাকা। বরপক্ষ পণের দাবি ছাড়লেন কাকা যৌতুকে তা পুষিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনের খুঁৎখুঁতি যে যায় না। সব গোপন করে এ কোন মহা অপরাধ আমি করতে যাচ্ছি। এখন পর্যন্ত যে কিছুই বলা হয়নি। না এ পক্ষকে, না ও পক্ষকে। কিন্তু এতদিন বাদে সে সব কথা কি ভাবে কোন ভাষায় আমি বলব। তা কিছুই ভেবে পেলাম না। বিয়েতে আমি শুধু আমার অসম্মতির কথা জানালাম। কিন্তু বাড়ির কেউ তা আমল দিলেন না। কাকা তো রীতিমত এক ধমকই দিলেন 'তুই কি সবাইর আনন্দ নষ্ট করবি লতু?'
সঞ্জয়দাকে বলতে গেলাম, তিনি বলে উঠলেন, 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা হে গরবিনী।'
ভাবলাম সুব্রতবাবুর সঙ্গে তো আমার আলাপ হয়েছে। বিয়ের আগে তাঁকেই সব কথা জানাই। তাঁকে লিখে দিই তাঁর স্ত্রী হবার যোগ্যতা আমার নেই। প্যাডের পাতায় লিখলাম, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু।' তারপর যত চেষ্টা করলাম আর একটি লাইনও এগোল না। তখন আমার মন বলতে লাগল এই ভালোমানুষির কোন মানে নেই, এর নাম ছেলেমানুষি। দু বছর আগে যে লতা ছিল আজকের লতার সঙ্গে তার কোন মিল নেই, সে নতুন জন্ম নিয়ে নতুন নারী হয়ে উঠেছে। তার আগের কলঙ্কের সঙ্গে আজকের দিনের কোন সম্পর্ক নেই। কেন আমি সেই কুশ্রী, দুর্গন্ধভরা দিনগুলির কথা তুলে এমন একটি মধুর সঙ্গীতের তালভঙ্গ করব? বলবার সুযোগ এর পরেও তো আসবে তখন বললেই হবে।
বেশ ঘটা পটা বাজি আর বাদ্যের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল। কাকা কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখলেন না। সবাই বলতে লাগল, 'লোক নিজের

'মেয়ের বিয়েতেও এত ব্যয় করে না।'

বেনারসী শাড়ী পরে, গা ভরা গয়না নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসবার আগে আমি কাকাকে প্রণাম করলাম।

কাকা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বউদির কথাটা আজ সকাল থেকে মনে পড়ছে। তিনি থাকলে কি সুখীই না হতেন! তাঁর কাছে যে অপরাধ করেছিলাম—বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। অপরাধ! অপরাধের কথা কি এমন দিনেও ভোলা যায় না। সব অপরাধেরই কি মাথা পেতে শাস্তি নিতে হয়?

শুভদৃষ্টির সময় স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হল। চন্দনচর্চিত সৌম্য শান্ত একখানি মুখ। সে মুখের দিকে এক পলকমাত্র তাকিয়ে আমি তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলাম। সীমাহীন আনন্দে আমার অন্তর ভরে গেল। ওঁকে তো আমি আরো দুদিন দেখেছি কিন্তু আজকের দিনের সঙ্গে কোন দিনের তুলনা হয় না।

বাসর ঘরের ভিড় ভাঙবার পর আমরা যখন ফের দুজনে মুখোমুখি হলাম স্বামী আমাকে কাছে টেনে নিয়ে হেসে বললেন, 'ছেলেবেলায় পড়েছিলাম জুলিয়াস সিজারের কথা। তাঁর বৃটেন আক্রমণের গল্প। ভিনি ভিসি ভিডি। এলাম দেখলাম জয় করলাম। আমিও সেই রকম দেখলাম ভালোবাসলাম বিয়ে করলাম। অবশ্য বিয়ে করা আর জয় করা ঠিক এক কথা নয়।'

এর আগে পুরুষের মুখে প্রেম নিবেদন তো কম শুনিনি। নিবেদন তো নয় প্রেমের নামে সে এক অবিচ্ছিন্ন আক্রমণ অত্যাচার উৎপীড়ণের কাহিনী। স্বামীর মুখের কথাগুলিকে মনে হল সুমধুর মন্ত্রের মত। এ কানের কাছে মৌমাছির গুণগুনানি নয়, ঋষির স্তব গুঞ্জরণ।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমি কি জয় করে নেবার মত দুর্ল্ভ কোন মেয়ে। অত দাম আমার নেই। আমার একফোঁটা সম্পদ নেই যে গৌরব করতে পারি।'

স্বামী বললেন, 'তোমার মত বিনয় করতে অন্তত কেউ পারে না। তুমি নিজেই তো এক সম্পদ তোমার আবার বাইরের সম্পদ কি থাকবে।'

সেই ঝরণার ধারে স্বামী কোন কথা বলতে না পারলেও বাসর ঘরে দেখলাম দিব্যি তাঁর মুখ খুলে গেছে।

তিনি বললেন, 'দেখ আমার বন্ধুরা আমাকে ডন কুইকসট বলে ঠাট্টা করে।

ডন কুইকসট ভাঙ্গা বাড়ীকে মনে করতেন দুর্গ, সাধারণ পথের মেয়েকে মনে করতেন রাজকন্যা। আমার বন্ধুরা বলে আমিও নাকি তাই। বৈজ্ঞানিক হয়েও রোমান্টিক বাতিকগ্রস্ত মানুষ। মেয়েদের সঙ্গে আমি অবশ্য মিশিনি, মেশবার সুযোগ পাইনি। দূর থেকে আমি তাদের শ্রদ্ধা করেছি। কাছে এসেও দেখলাম আমি ঠকিনি।'

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। একবার আবার মনে হল এই সেই উপযুক্ত মুহূর্ত উপস্থিত। এইবার ওঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ব, এইবার স্বীকার করে বলব 'আমি তোমাকে ঠকিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।'

কিন্তু কিছুতেই তা পেরে উঠলাম না। সুন্দর করে বাসর সাজিয়েছে মেয়েরা। এক কোণে ঘিয়ের দীপ জ্বলছে। সুমধুর মৃদু গন্ধে সমস্ত ঘর ভরে গেছে। আর এই ঘরের মধ্যে আমার স্বামীকেই কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে। এমন এক মধুর মনোহর পরিবেশে সেই কুশ্রী কথাগুলি কি করে উচ্চারণ করব? কী করে আমি ওঁর স্বপ্ন ভাঙব? আর সেই ভাঙবার ফল কী হবে তাতো আমার জানা নেই। তাতে যদি খান খান হয়ে সব ভেঙে পড়ে? আমার চিরজীবনের সাধের ঘর একরাত্রে যদি ধূলিস্তাৎ হয়, তাহলে? উনি যদি বলেন, এসব কথা আগে বলনি কেন? তাহলে আমি কি বলব? আগে যখন বলিনি তখন আজও বলা সম্ভব নয়, আজকের রাত্রে নয় অন্তত। এমন রাত তো জীবনে একবারের বেশি আসে না। খানিক বাদে তিনি বললেন, লতা আমিই শুধু নিজের মনে বক বক করে যাচ্ছি, তুমি একটি কথাও বলছ না। অত লজ্জা কেন তোমার? তুমি মোটেই একালের মেয়ের মত নও।'

আমি অতি কষ্টে বললাম, 'আমি বড় দুর্ভাগিনী।'

স্বামী চমকে উঠলেন, 'ওকথা বলছ কেন? আজ কি ওসব কথা বলে? আচ্ছা সত্যি করে বলতো আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি? আমি ভেবেছিলাম বিয়ের আগে তোমাকে সে কথা জিজ্ঞেস করে নেব। আমরা পুরুষরা শুধু নিজেদের পছন্দ, অপছন্দের কথাই ভাবি— মেয়েদেরও যে মন আছে, রুচি আছে সে কথা ভেবে দেখিনি। কিন্তু কথাটা খোলাখুলিভাবে আমি কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারিনি। কেমন যেন

লজ্জা করেছে। আমি আমার বোন রঞ্জনাকে সে ভার দিয়েছিলাম কিন্তু দেখছি সে তার কথা রাখেনি।'

আমি বললাম, 'তুমি যে দয়া করে আমাকে বিয়ে করেছ এ আমার পরম ভাগ্য। এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।' তিনি হেসে বললেন, 'আজ-কালকার মেয়েরা অত বিনয় করে না। তুমি ঢের পিছিয়ে আছো সেজন্য ভাবনা নেই। রঞ্জনা তোমাকে একটানে একবিংশ-শতাব্দীতে নিয়ে যাবে।' একটু থেমে বললেন, 'তুমি নিজেকে দুর্ভাগিনী কেন বলছ তা আমি এবার বুঝতে পারছি। তোমার বাপ নেই, মা নেই, বোন নেই। আজকের দিনে তাদের কথা তোমার মনে তো পড়বেই। সে কথা ভেবে আর কি হবে বল। সবারই জীবনের ধারা তো এক খাতে বয় না? কিন্তু আমাদের পরিবারটিকে তোমার খুব ভালো লাগবে। আমার বাপ মা ভাইবোনের মধ্যে তুমি আপনকে ফিরে পাবে। মেয়েরা তো তাই পায়।'

পরদিন কাকাদের সংসার থেকে বিদায়ের পালা। রাত্রে গাড়ি। কিন্তু দুপুরের পর থেকেই শ্বশুর মশাই তাড়া দিতে শুরু করলেন। গোছ গাছ বাঁধা-ছাঁদার পাট চলতে লাগল। তারই এক ফাঁকে কাকা আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'দুদিনের জন্য উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলি। আবার ফের শিকল কেটে উড়ে চললি। এই নিয়ম সংসারের।'

আমি বললাম, 'কাকা আপনি কিন্তু অবসর পেলেই কলকাতায় যাবেন।'

এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারলাম না। আমারও গলা ধরে এল। জল ভরে এল চোখে।

কাকীমার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সঞ্জয়দাকে প্রণাম করে বললাম, 'যাবেন কিন্তু কলকাতায়।'

সঞ্জয়দা হেসে বললেন, 'দূর দূর। অমন জায়গায় মানুষে যায়? ভারী পাজি জায়গা।'

তিনি অবশ্য পরিহাস করেই কথাটা বললেন। কিন্তু আমার বুকের ভিতর ধক করে উঠল। আবার সেই কলকাতা। না জানি কি আছে ভাগ্যে।

আবার সেই কলকাতা। কিন্তু মাণিকতলার বস্তী আর বালিগঞ্জের এই শিক্ষিত ভদ্র পাড়ায় আকাশ পাতাল তফাৎ। তাদের সঙ্গে এদের কিছুতেই

মিল নেই। না পোষাক পরিচ্ছদে, না চালচলনে, না কথা-বার্তায়।
আমার শ্বশুর বড়লোক নন, কিন্তু বেশ হিসেবী মানুষ। ষ্টেশন রোডের এই দুই কাঠা জায়গা নাকি তিনি বছর দশেক আগেই বেশ একটু সস্তাতেই রেখেছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে এই দোতলা বাড়ী তুলেছেন। নিচে ওপরে চারখানা ঘর।
পিছনে যে জায়গাটুকু বেঁচেছে আমার শ্বশুর তাতে ছোট একটু বাগানের মত করেছেন। দেশী বিদেশী মরসুমী ফুল সেখানে ফোটে। শ্বশুর মশাই নিজেই সে বাগানের পরিচর্যা করেন। আমার স্বামীর ওসব দিকে বড় একটা নজর নেই।
এঁদের সংসারও বড় নয়। আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী, স্বামী আর তাঁর একটি মাত্র বোন রঞ্জনা। কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। চারজনের মধ্যে আমি এসে পড়ায় দল একটু ভারি হল। সবাই আমাকে আদর করেই ঘরে তুললেন। আমার একমাত্র গুণ আমি আমার স্বামীর চিরকুমার থাকবার সঙ্কল্প ভাংতে পেরেছি। এতদিন তিনি বিয়ে করতেও চাননি আর যে সব মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এসেছে তাদের কাউকে তার পছন্দও হয়নি। রঞ্জনার কাছে পরে তার আপত্তির কারণ শুনেছি। তিনি নাকি বলতেন, 'কসমেটিকই ওদের একমাত্র কালচার। তাছাড়া ওদের আর কি সম্বল আছে?'

সম্বল আমারও কিছু নেই। তা আমি নিজের মনে জানি। কাকা কাকীমার স্বচ্ছল সংসারে গিয়ে আমার গায়ে রঙ আর মাংস দুইই লেগেছিল। কিন্তু শুধু আমার রূপই যে আমার স্বামীকে আকর্ষণ করেছে একথা ভাবতে আমার ভালো লাগেনি। আমার বাপ মা নেই, আমি দুঃখিনী আমি করুণার যোগ্য আমাকে পছন্দ করবার সময় এসব কথাও তার নিশ্চয়ই মনে হয়ে থাকবে। আর তাছাড়া সেই উশ্রী ঝরণা, সেই সোনালী সূর্য্যাস্ত, আমাদের ঘটকালিতে তাদেরও কি কোন হাত ছিল না?
কিন্তু আমার শাশুড়ী তো সে সব কথা জানেন না, বিশ্বাসও করেন না। তিনি ভাবলেন শুধু ভাবলেনই বা বলি কেন পাড়াপড়শী দু' একজনের কাছে বলেও ফেললেন, 'এই জন্যেই আগেকার দিনে শুভ-দৃষ্টির আগে বর কনের দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার কোন নিয়ম ছিল না।

কাকে কোন চোখে দেখে তার তো কিছু ঠিক নেই। আজকালকার ছেলেদের কথা আর বলো না। বউয়ের রূপ থাকলেই হলো আর কিছু থাকবার দরকার নেই। বাপ মা, ঘর বাড়ী, কুলশীল কিছুই দেখতে হবে না।'

রঞ্জনা বলল, 'মা, ওসব কথা তো বিয়ের আগে অনেকবার হয়ে গেছে। এখন আর ওকথা তুলে লাভ কি। তাছাড়া দুষতে হয় দাদাকে দোষ। বউদি বেচারাকে ওসব কথা শুনিয়ে লাভ কি?'

আমার শাশুড়ী বললেন, 'আমি তোমার বউদিকেও দুষিনে, দাদাকেও দুষতে চাইনে। সব আমার ভাগ্যের দোষ আর যার হাতে পড়েছি তার বুদ্ধির দোষ। তুমি তো আর কচি ছেলে নও, তোমার ষাট বছর বয়স হতে চলল, তুমি কি দেখে এ সম্বন্ধ করলে শুনি?' শেষ কথাগুলি আমার শ্বশুরের উদ্দেশ্যেই অবশ্য বললেন তিনি।

শ্বশুরমশাই খুপড়ি দিয়ে বাগানে ঘাস নিড়াচ্ছিলেন। সেই মাটিমাখা হাত নিয়েই উঠে এসে বললেন, 'যা দেখবার আমি ঠিকই দেখেছি। তোমার গলাবাজিটা এবার দয়া করে বন্ধ কর।'

শাশুড়ী বললেন, 'আমি কথা বললেই তো তা তোমার গলাবাজি বলে মনে হয়। ঠিকুজি তো দেখেছ বললে। কিন্তু এক কাকার পরিচয় ছাড়া মেয়ের বংশ পরিচয় আর কী আছে। সে কাকাও তো শুনেছি আপন কাকা নয়। পাড়ার পাঁচজনে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে বউয়ের বাবা মা—'

শ্বশুর মশাই অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আঃ হাজার বার তো শুনেছ তারা মারা গেছেন। মারা যাওয়া তো আর মানুষের অপরাধ নয়। তুমি আমিও অমর বর নিয়ে এসেছি ভেব না।'

শাশুড়ী বললেন, 'অমর বর নিয়ে আসব কেন। আমি যদি মরি তুমিও বাঁচ আমারও হাড় জুড়োয়। সে কথা আর বলছিনে?'

—'তবে কি বলছ?'

শাশুড়ী বললেন 'বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। বলি মারা যাওয়ার আগে লোক দুটো এই পৃথিবীতেই ছিল। তখন তারা কোথায় থাকত কি করত তার তো একটা খোঁজ খবর নিতে পারতে?'

শ্বশুর মশাই বললেন, 'আমি কি টিকটিকি না গোয়েন্দা পুলিস যে মরা মানুষের পিছনে পিছনে ঘুরব?' খোঁজ খবর যদি পেতে হয় দুদিন সবুর কর,

একেবারে স্বর্গে গিয়েই বেয়াই বেয়ানের সঙ্গে মোলাকাত করা যাবে।'
তারপর একটু থেমে তিনি শান্তভাবে বললেন, 'শীতাংশু গাঙ্গুলীর ভাইঝি এই তো আমার কাছে মেয়ের যথেষ্ট সার্টিফিকেট। তা সত্বেও আমি খোঁজ খবর নিয়েছি মেয়ের বাপ মাণিকতলা হাইস্কুলে মাষ্টারি করতেন। আর বউমা নিজেই তো রয়েছে! ওর বাপ মার খবর ওকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।'
শাশুড়ীর পক্ষে তাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করবেন বলেই বোধ হয় তিনি সরাসরি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেন নি।
আমি অন্য ঘর থেকে ওঁদের কথাবার্তা সব শুনছিলাম। হঠাৎ খোঁজ খবরের কথাটায় আমার বুকের ভিতর ধক করে উঠল। সত্যিই যদি আমাকে ওঁরা রাস্তার নাম নম্বর জিজ্ঞেস করেন আর কোন কারণে সেখানে কেউ যদি খোঁজ খবর নিতে যান তাহলে কি হবে? বিয়ের আগে আমার স্বামী কি শ্বশুর অত সন্ধান করেননি। নিজেদের আর নতুন কাকার উপর গভীর বিশ্বাসের ফলেই তারা তার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু আমার শাশুড়ী যদি এখন সব খুঁচিয়ে তোলেন, যদি সত্যিকারের ঠিকানা পেয়ে কোনদিন সেখানে গিয়ে সত্যিই কেউ হাজির হন? একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলেই, তাহলে কি ওঁদের কোনকথা জানতে আর বাকী থাকবে? সে কথা ভেবে আমার মাথা ঘুরে গেল। মনে মনে ভাবলাম উঁহু কাউকে রাস্তার নাম আর নম্বর আমি কিছুতেই বলব না কিন্তু বার বার সেই মিথ্যাচার শুরু করতে হবে ভেবেও আমার ভালো লাগল না। জীবনে এই মিথ্যার হাত থেকে কি কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই?
রঞ্জনা কোত্থেকে একটি বেলফুলের মালা এনে আমার খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বউদি, মুখখানা অমন কালো করে বসে আছ কেন? কি হয়েছে তোমার?' হাসতে চেষ্টা করে বললাম, 'কি আবার হবে?' রঞ্জনা বলল, 'উঁহু কিছু একটা হয়েছে। মার কুঁদুলে স্বভাবটা আর গেল না!'
হেসে বললাম, 'ছিঃ মার সম্বন্ধে অমন কথা বলে নাকি?'
রঞ্জনা বলল, 'আমি ভাই কিছু রেখে ঢেকে বলবার মানুষ নই।'

যা বলবার মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলে দিই। কাউকে পরোয়া করিনে। এই সম্বন্ধের ব্যাপার নিয়ে বিয়ের আগে কি কম ঝগড়াটা হয়েছে মা আর বাবার মধ্যে। দাদার সঙ্গেও কম মন কষাকষি হয়নি। কিন্তু ভোটে শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতে গেলাম। মা হেরেছে কিন্তু হারাটা মানিয়ে নিতে পারছে না। এর মূলে আছে আমার মামার বাড়ির লোকেরা। তাঁরা পাঁচ কথা বলে মার মন খারাপ করে দিচ্ছে।'

রাত্রে এসে আমার স্বামীও সেই কথা বললেন। কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুখখানা অত ভার ভার কেন?'

হেসে বললাম, 'বাঃ ভার ভার আবার কোথায় দেখলে?'

স্বামী বললেন, 'আমি সব বুঝতে পারি লতা। মার ওসব কথাবার্তা আমারও ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় কি বল। আস্তে আস্তে সব মানিয়ে নিতে হবে। দু দিন বাদে উনি নিজেই সব বুঝবেন। এ বাড়ীর তিনটি হৃদয় দুর্গই তো জয় করেছ। চতুর্থ দুর্গটি জয় করতে না হয় কিছু সময় লাগলই। পৃথিবীর সব জিনিসই যদি আমরা সহজে পাই তাহলে পাওয়ার অর্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে যায়।'

স্বামী ঠিকই বুঝেছিলেন। সেবায় পরিচর্যায় শাশুড়ীর হৃদয়টা জয় করে নিতে আমার বেশি সময় লাগল না। আমি ভাবলাম যা পেয়েছি তাতো আমার পাওয়ার কথা ছিল না। এ আমার ভাগ্য দেবতার দান। এই দানকে শুধু দু হাত পেতে নিলেই চলবে না। একে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। সেবা শুশ্রূষা আর আনুগত্য পেলে গুরুজনেরা সব চেয়ে খুশী হন সে জ্ঞান ছিল। আমি তাই শাশুড়ীর হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে করতে লাগলাম। রান্না বান্না ঘর দোর পরিষ্কার করা সব নিজের হাতে নিলাম। শ্বশুর শাশুড়ীর খাওয়া দাওয়া তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর সযত্নে দৃষ্টি রাখলাম। ওঁদের মন রাখবার জন্যই যে এত খাটতে লাগলাম তা নয়, কাজের উৎসাহ আমার নিজের ভিতর থেকেই এল। এতো আর পরের সংসারের জন্যে খাটছি না। নিজের সংসারের জন্যেই পরিশ্রম করছি। ভাবতে কি ভালোই না লাগে এতদিন পরে আমি নিজের যোগ্যতায় স্বামী আশ্রয় খুঁজে পেয়েছি। আমি এখন আর কারো করুণার প্রার্থী নয়, কারো অনুকম্পার পাত্রী নয়, আমি নিজের সংসারের গৃহিনী।

রোজ স্বামীর আদরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, ভোর বেলায় তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে চুপি চুপি উঠে যাই। শান্ত পরিতৃপ্তিতে তাঁর মুখ অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। কোন কোন দিন দুষ্টুমি করে তিনি আমার আঁচল টেনে ধরেন। আমি লজ্জিত হয়ে বলি, 'আঃ ছাড় ছাড়, বাবা মা উঠে পড়েছেন। আমাদের দোর খুলতে দেরি হলে ওঁরা কি ভাববেন বলতো।' তিনি হেসে বলেন, 'কি আর ভাববেন! নিজেদের প্রথম যৌবনের কথা কি ওঁরা এত শিগগিরই ভুলে গেছেন?'
আমি লজ্জা পেয়ে বলি 'ছি ছি ছি তোমার মুখে কিছুই আটকায় না।'

রাত্রে আর ভোরে স্বামীর এই আদর সোহাগ হাসি পরিহাস আমার সারাদিনের সঞ্চয় হয়ে থাকে। স্বামী বলেন, তাঁরও তাই হয়। কাজ-কর্মে তাঁর নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের শক্তি নাকি আরো বেড়ে গেছে। নাওয়া খাওয়া শেষ করে সাড়ে নটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম। সেখানে কাজ কর্মের চাপ বেড়েছে। রঞ্জনা একেক দিন বলে 'দাদা, এ তো পরের অফিস নয়, নিজেরই অফিস। যখন খুশি যাবে যখন খুশি চলে আসবে। তোমার অত বাঁধাবাঁধির দরকার কি?'
স্বামী হেসে বলেন, 'তোর যেমন বুদ্ধি। নিজে নিয়ম মেনে না চললে কি পরকে সে নিয়ম মানানো যায়?'
আমার স্বামীর ধরণ ধারণই ওই রকম। ভিতরে ভিতরে বেশ একটু শক্ত মেজাজের মানুষ। রুটিন মাফিক চলাই তাঁর অভ্যাস। নিয়ম আর সময়ের ওপর তাঁর এই নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর বন্ধুরা কোন কোন সময় ঠাট্টা করলে তিনি বলেন, 'কি করব বল অগোছালো ভাবে আমি কাজ করতে পারিনে, তাতে কাজটা বোঝার মত লাগে।'
আমার স্বামীর এই নিষ্ঠাকে ভিতরে ভিতরে সকলেই বেশ একটু শ্রদ্ধা আর সমীহ করে চলে। তাই বলে তিনি যে নীরস তা নন। তাঁর রসের উৎস, স্নেহ ভালোবাসার উৎস যে কত গভীর তার পরিচয় তো নিত্যই পাই।

দিনের পর দিন প্রায় একই ধরণে কাটে। ভোর বেলায় আমরা এক সঙ্গে বসে চা খাই। আগে এ বাড়িতে মেয়েরা আর পুরুষেরা

ভিন্ন ভিন্ন সময় খেতেন। কিন্তু আমার স্বামীর হাতে কর্তৃত্ব আসায় তিনি নিয়ম কানুন বদলে দিয়েছেন। তিনি মেয়েদের সমান অধিকারের পক্ষপাতী। স্বাধীনভাবে চলাফেরা মেলামেশার সুযোগ না পেলে মেয়েদের পূর্ণ বিকাশ হয়না এই তার মত। তিনি বলেন নারী আর পুরুষ একই সমাজ দেহের দুই অঙ্গ। তার এক অঙ্গকে অচল অকর্মণ্য করে রাখলে অন্য অঙ্গেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। স্বামীর এই উদার মনোভাবে তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ভয়ও হয়। তাঁর উদারতা যেমন আছে ভিতরে ভিতরে নীতি নিয়মের ওপর তাঁর নিষ্ঠাবোধ তেমনি কড়া। স্বভাবের কোন রকম শৈথিল্যকে তিনি ক্ষমা করেন ; বাপ মা বোন লঘুগুরু এ ব্যাপারে সবাইকেই তিনি সমান শাসন করেন। একদিন রঞ্জনা তার এক বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। ফিরতে বেশ রাত হল। আমার শ্বশুর শাশুড়ী সবাই চিন্তায় অস্থির। কিন্তু স্বামী রইলেন শান্ত হয়ে। রঞ্জনা ফিরে এলে শুধু একটি কথা বললেন, 'যাবিই যদি বলে যাসনি কেন? জানিসতো লুকোচুরি আর মিথ্যা কথাকে আমি একদম সহ্য করতে পারিনে।'

তাঁর সেই সামান্য তিরস্কারে রঞ্জনা লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে তুলে নিয়ে এসে আমি খাওয়ালাম। কিন্তু বুকের ভিতরটা আমারও কেন যেন দুরু দুরু করতে লাগল। আমার এই যে সুখের দাম্পত্য জীবন এর প্রতিষ্ঠাও তো লুকোচুরির ওপর। চোরাবালির ওপর এই যে সাধের স্বপ্নসৌধ আমি গড়ে তুলেছি এ সৌধ চিরকাল স্থায়ী থাকবে তো?

দিনগুলি প্রায় এক রকম ভাবেই কাটে। চায়ের পাট শেষ করে শাশুড়ী বউতে মিলে আমরা রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকি। শ্বশুর নিজেই বাজার করেন। সবগুলি রান্না শেষ হতে না হতে স্বামী খেয়ে অফিসে চলে যান। রঞ্জনা যায় কলেজে। দুপুরে শ্বশুর মশাই খাওয়া দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নেন। আমি মাথার পাকা চুল বেছে দিই। কোন কোন দিন বই পড়ে শোনাই। কখনো বা তিনি শিকারের গল্প বলেন। আসামের বিহারের মধ্যপ্রদেশের কত সব জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছেন আর কত জন্তু জানোয়ার শিকার করেছেন সেই সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী। আমার শাশুড়ী এক একদিন ধমক দিয়ে বলেন 'নাও এখন ঘুমোওতো। বক বক করে করে

কানে পোকা ধরিয়ে দিলে। তোমার ঐ শিকারের গল্প শুনে শুনে কান আমার পচে গেল।'

শ্বশুর মশাই বলেন, 'আমি তো তোমার কাছে বলছিনে আমি আমার মার কাছে বলছি। তোমার ভালো না লাগে কানে তুলো দিয়ে থাকো।'

বিকেলেও সংসারের কাজকর্ম থাকে। কাপড় তোলা বিছানাপাতা ঘর ঝাড় দেওয়ার নিত্য-কর্ম। বাথরুমে গিয়ে গা ধুই, চুল বাঁধি, রঞ্জনা ফিরে এলে তাকে নিয়ে ছাদে বসে বসে খানিকক্ষণ গল্প গুজব করি। তার বিকেলের আগে চায়ের পর্ব শেষ হয়ে যায়। শ্বশুর মশাই বেরিয়ে পড়েন পাড়াপড়শীর খোঁজ-খবর নিতে। কোনদিন বা রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় তাসের আড্ডায় জমে যান।

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে আমার স্বামীর সন্ধ্যা উৎরে যায়, কিন্তু তাঁকে খুব বেশি ক্লান্ত লাগে না। নিজের হাতে আমি তার জন্যে চা খাবার করি। খেতে খেতে তিনি গল্প করেন। কোন দিন নিজের কাজ কর্মের কথা, কোনদিন বা দেশের রাজনীতি সমাজনীতির প্রসঙ্গও ওঠে। ভাই বোনের মধ্যে তো দারুণ তর্ক লেগে যায়।

কদাচিৎ আমরা লেকের ধারে বেড়াতে বেরোই, মাসে দু এক দিন সিনেমা থিয়েটারেও যাওয়া হয়। দু চার জন স্বজন বন্ধুও মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসেন, আমরাও কখনো কখনো রিটার্ণ ভিজিট দিতে যাই।

দিনগুলি মোটেই ঘটনাবহুল নয়, এর মধ্যে কোন অনিশ্চয়তা বা অপ্রত্যাশিত কিছু নেই, যেমন আমার আগের জীবনে ছিল। অচেনা কেউ এখানে আর আসে না অদ্ভুত কোন ঘটনা ঘটে না। কিন্তু সেজন্যে আমার কোন আক্ষেপ নেই।

কয়েকটি চেনা মানুষ নিয়ে গড়া বেশ একটি সুন্দর ছোট সুখের জগৎ আমাকে ঘিরে রেখেছে। এ জগৎকে আমার মোটেই সংকীর্ণ কিংবা একঘেয়ে মনে হয় না। কেনই বা হবে। অনেক ঝড় ঝাপটার শেষে আমি একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছি। এ বাসা আমার ভালবাসার স্বাদে নিত্য মধুর। ক্ষুধার অন্ন যেমন সুধায় মাখা এও তেমনি।

প্রথম প্রথম অবশ্য কাকা কাকীমা আর সঞ্জয়দার জন্যে মন পুড়ত। দু বছরে ওঁরা শুধু আমার রূপান্তর না জন্মান্তর ঘটিয়েছেন। তা ছাড়া আমার এই

সুখ আর সৌভাগ্যের মূলেও তো ওঁরাই। ওঁদেরই জন্মে আমি সব পেয়েছি। কাকার কথা ভেবে আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠত। সেই কথা আমি চিঠিতে ওঁদের জানাতাম। কাকাকে কাকীমাকে সঞ্জয়দাকে আমি চিঠি লিখতাম। ওঁরাও জবাব দিতেন। নিজের নামে চিঠি এলে কি ভালোই না লাগে। সঞ্জয়দাও লম্বা লম্বা চিঠি লিখতেন। একদিন আমার স্বামী বললেন, 'কি লিখেছে সেই চিরকেলে পেসিমিষ্টটা? নিশ্চয়ই পাতায় পাতায় হা হুতাশ করেছে। ও জানে না, সুখ অতি সহজ সরল।'

কথা কটি ভারি ভালো লাগল। সুখ অতি সহজ সরল। এই সহজ সরল সুখের স্পর্শ থেকে আমি বহুদিন বঞ্চিত ছিলাম বলে এখন আর আক্ষেপ করিনে। এখনকার দিনগুলি আমার অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়েছে। সে যেন জন্মান্তরের এক দুঃস্বপ্ন। আমার বর্তমানের বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

কয়েকদিনের জন্মে রাঁচী থেকে ঘুরে এলাম। স্বামীকে ছেড়ে যেতে এবং ছেড়ে থাকায় ভারি কষ্ট। কিন্তু কাকা আদর করে নিতে চেয়েছেন না গিয়ে তো পারিনে। বিচ্ছেদের দিনগুলি দু'তরফের চিঠিপত্রে ভরে উঠল। আপনজনকে চিঠি লিখতেও কি আনন্দ। কোথাও লুকোচুরি নেই, ভয়ের কিছু নেই, নিজের অধিকারের মধ্যে অবাধ বিচরণ। এর চেয়ে সুখের আর কি থাকতে পারে। আমার স্বামী বেশি বড় চিঠি লিখতে পারেন না। বেশি উচ্ছাস প্রকাশ করতেও বোধ হয় তাঁর লজ্জা করে। যেমন ভাষায় তেমনি চিঠিতে বাক সংযমেই তিনি অভ্যস্ত। তবু মাঝে মাঝে দুটি একটি কথা ভারি চমকে দেয়। একবার লিখলেন, 'তোমার মধ্যে অতল গভীর এক রহস্য রয়েছে। আমি যে রহস্যের ধারে কাছেও পৌছতে পারিনি। নাইবা পৌছলাম। তাতে আমার ক্ষোভ নেই। সে রহস্য তোমাকে আরো সুন্দর করেছে। জীবনে আরো গভীরতা এনে দিয়েছে। আমি তাতেই তৃপ্ত।'

চিঠি পড়ে আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আমার স্বামী আমার পূর্ব জীবনের কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি। আমি গরীবের ঘরের মেয়ে খুব দুঃখে কষ্টে দিন কেটেছে। স্কুলে কয়েক বছর পড়াশুনো করেছিলাম।

মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা আর এগোয়নি। এর চেয়ে বেশি কিছু আমিও তাঁকে বলিনি, তিনিও জানতে চাননি। আমার সেই অপ্রকাশিত অতীত জীবনকেই কি তিনি রহস্য আখ্যা দিয়েছেন ?
তাঁর চিঠির জবাবে আমি লিখলাম 'আমি নিতান্তই সাধারণ মেয়ে। আমার মধ্যে রহস্য বা গভীরতা বলে কিছু নেই। তুমি নিজে বড় বলে আমাকে অমন বড করে দেখছ।'

বিরহের দিনগুলি দীর্ঘ হল না আবার ফিরে এলাম শ্বশুর বাড়িতে, নিজের ঘরে এসে পরম তৃপ্তি পেলাম। আমার আপন ঘর আমার স্থায়ী ঠিকানা।

এবার রাঁচী থেকে কাকার লেখা চিঠির সঙ্গে আর একখানা পোষ্ট কার্ড এল রিডাইরেকটেড হয়ে। আমার শ্বশুর মশাই পিওনের হাত থেকে নিয়ে এলেন চিঠি দু'খানা। বললেন, 'নাও লতা। যত চিঠি সব তোমার নামেই। এত জায়গায় ঘুরেছি, এত বন্ধুবান্ধব। কিন্তু কেউ একবার ভুলেও মনে করে না। out of sight out of mind কিন্তু তোমার বেলায় দেখছি সব উল্টো। তোমাকে সবাই মনে করে রেখেছে।'
হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কথা বলছেন বাবা।'
তিনি বললেন, 'কে এক শ্যামলাল তোমাকে চিঠি লিখেছে দেখ।'
রঞ্জনা বলল, 'বাবা, তুমি বুঝি বউদির চিঠি পড়েছ ? তোমার ওই এক বদ-অভ্যাস। চুরি করে পরের চিঠি পড়।'
শ্বশুরমশাই বললেন, 'বউমা বুঝি আমার পর ? তুই দুদিন বাদে পর হয়ে যাবি। কিন্তু বউমা চিরকালের জন্যে আপন হয়ে এসেছে। পোষ্টকার্ডের চিঠি পড়েছি তাতে এমন কিছু দোষের হয়নি কি বল মা ? পোষ্টকার্ডে তো কেউ কোন গোপন কথা লেখে না।'
আমি হেসে বলতে গেলাম, 'বাঃ গোপন আবার কি আছে।' কিন্তু হাসিও তেমন ফুটল না, কথাও তেমন বেরোল না। তা আমি নিজেই বুঝতে পারলাম। একটু আড়ালে গিয়ে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লাম। বুঝতে পারলাম আমার শ্বশুরমশাই শুধু নামটাই পড়েছিলেন, চিঠিখানা পড়েননি। তাহলে আর অত হাসিঠাট্টা করতেন না। শ্যামদার লেখা চিঠিই বটে। কাঁচা হাতের লেখা। হরফগুলি বড় বড়। যে তারিখে লেখা, তার অনেক পরেই নিশ্চয়ই ডাকে দেওয়া হয়েছে। চিঠি পাচ্ছি পনের দিন বাদে। চিঠির ভিতর থেকে দুঃখের খবরই বেড়োল। শ্যামদার ছেলেটি

মারা গেছে। খারাপ ধরণের জ্বর হয়েছিল। ভালো করে চিকিৎসা করতে পারেনি। খাওয়াই জুটত না তার আবার চিকিৎসা। সে নিজেও মরণাপন্ন। আমার কাছে চাইবার তার মুখ নেই। তবু যদি গোটা দশেক টাকা দয়া করে তাকে আমি পাঠাই বড় উপকার হয়। যদি ভালো হয়ে ওঠে তাহলে কাজকর্ম করে সে টাকা সে নিশ্চয়ই শোধ দেবে।

শ্যামদার ছেলেটি মারা যাওয়ার কথা শুনে আমার মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। আহা হা সেই লোভী বুভুক্ষু ছেলেটি যে বলেছিল, 'আমার জন্য হাওয়া এনো আমি খাব।'

শ্যামদার চিঠিতে সেই দুঃস্থ নিপীড়িত নিরন্ন পরিবারটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। না খেয়ে আধ পেটা খেয়ে কি দুঃখের দিনগুলিই না আমার কেটেছে। আমি কোনরকমে পার হয়ে এসেছি। কিন্তু যমুনা বউদির দুঃখের দিনগুলি আর গেল না।

আমার শাশুড়ী এসে বললেন, 'কার চিঠি লতা ?'

আমি বললাম, 'শ্যামলালদার।'

তিনি বললেন, 'শ্যামলালদা আবার কে ?'

আমি বললাম, 'মানিকতলায় আমরা একই বস্তিতে থাকতাম।'

শাশুড়ী একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'বস্তিতে থাকতে নাকি তোমরা ? কই এর আগে তো সে কথা বলনি।'

আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম।

রঞ্জনা কাছেই ছিল। সে বলল, 'এর মধ্যে বলাবলির আবার কি আছে মা, ভাড়াটে বাড়িতে কত ভাবে কত লোক থাকে। জানো তো মা বাড়ির কি অভাব শহরে। নিজেদের একখানা বাড়ি আছে কিনা তাই। আমাদের ক্লাসের অনেক মেয়ে বস্তির ভিতর থেকে আসে। জানো তো না সে কি কষ্ট।'

মনে মনে ভাবলাম, জানি আবার না!

একবার ভাবলাম টাকাটা আমি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসব। তাকে আমার দেওয়া উচিত। কত সময় কত উপকার করেছে। তা'ছাড়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে আমার মান বাঁচাতে গিয়েছিল।

আবার ভাবলাম আমার নিজের যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমি এ বাড়ির বউ। অবশ্য আমার স্বামীকে কি রঞ্জনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তাও কি নিরাপদ হবে? বস্তির লোকজন ভালো না। তাছাড়া

ওপাড়ায় আমার শক্রর তো অভাব ছিল না। কে কোত্থেকে দেখে ফেলবে কখন কি বলে বসবে আমার মান প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। উঁহু, ও জায়গায় আমার যাওয়া চলবে না। টাকাটা মানিঅর্ডার করে পাঠানোই বোধহয় সব চেয়ে ভালো। কিন্তু এ পদ্ধতিও আমার শেষ পর্যন্ত মনঃপূত হল না। বস্তির মধ্যে পিওন গেলেই তার ওপর সকলের চোখ পড়বে। কে পাঠালো টাকা কোত্থেকে পাঠালো তাই নিয়ে একটা হৈ চৈ হবে। লেখালেখি পোষ্ট অফিস এসবের মধ্যে গিয়ে কি দরকার। তার চেয়ে কারো হাতে টাকাটা চুপিচুপি পাঠালেই আর কোন গোলমাল থাকে না। অথচ শ্যামলালদাও উপকৃত হয়। আমি তাই স্থির করলাম। স্বামী বেরিয়ে গেলেন অফিসে। রঞ্জনা কলেজ চলে গেল। শ্বশুর শাশুড়ী ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি দুপা এগিয়ে গিয়ে আমাদের পাশের বাড়ির পার্থকে ডাকলাম। পার্থ আমাদের প্রতিবেশি এডভোকেট প্রফুল্ল সেনগুপ্তের ছেলে। আই-এস-সি পরীক্ষার পর অবসর সময়টা নভেল পড়ে আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটাচ্ছে। আমার কাছে প্রায়ই আসে, 'বৌদি একখানা বই দিন।'

ভারি অনুগত আর ভালো ছেলে, মিষ্টি চেহারা আর মিষ্টি স্বভাব। আরো একটা কারণে ওদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হয়। ওদের বাড়িতে ফোন আছে। কোন জরুরি দরকার টরকার হলে আমার স্বামী ওদের বাড়িতে ফোন করেন। ওরা খুব ভদ্র। ডেকে দিতে কোন বিরক্তি বোধ করে না। আর তার জন্তে আমরাও নানা ভাবে ওদের আপ্যায়ন করি। বাড়িতে ভালো কোন জিনিস তৈরি হলে পাঠিয়ে দিই কি মাঝে মাঝে চায়ে বলি।

পার্থকে ডেকে বললাম, 'তোমাকে একটা কাজের ভার দেব, করতে পারবে তো?'

পার্থ হেসে বলল, 'আমি কোন কাজটা না পারি বৌদি। বাবা বলেন এক পরীক্ষার পড়া ছাড়া সব কাজেই আমার উৎসাহ আছে।'

বললাম 'আর বিনয় করতে হবে না, পরীক্ষায় তুমি ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করবে।'

তারপর আমি কাজের কথাটা পাড়লাম। মানিকতলায় ফুলবাগান বস্তির ঠিকানা আর পথের ডিরেকশন বলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'এই টাকাটা

শ্যামলাল দাস নামে এক ভদ্রলোককে পৌছে দিতে পারবে তো ?
পার্থ বলল, 'এই মাত্তর, আমি ভাবলাম কি সাংঘাতিক কাজই না জানি আপনি আমাকে বলবেন।'
আমি বললাম 'এও কম কঠিন কাজ নয়। যদি ভালো ভাবে করে আসতে পার তোমাকে দারুণ খাইয়ে দেব।'
পার্থ বলল, 'উঁহু, আমাকে অত পেটুক ভাববেন না। রোজ একখানা করে নভেল দিলে আমি তার চেয়ে বেশি খুসি হব।'
বলে পার্থ হাসতে হাসতে টাকা নিয়ে চলে গেল। বাসভাড়াটা কিছুতেই নিল না। দশটা টাকা আমি অবশ্য কারো কাছ থেকে চেয়ে দিলাম না। আমার নিজের তহবিল থেকেই দিলাম। বিয়েতে যে আশীর্বাদী টাকাগুলি পেয়েছিলাম তার সবই অবশ্য শাশুড়ীকে ধরে দিয়েছি। তা'ছাড়াও আমার কাছে শ' খানেক টাকার মত জমেছিল। কাকা দিয়েছিলেন গোটা পঞ্চাশেক টাকা, আর স্বামীও প্রতিমাসেই কিছু কিছু দিতেন। আমি তার ভাগ দিতাম রঞ্জনাকে। সে তাই দিয়ে টুকিটাকি সৌখীন জিনিসপত্র কিনত।

পার্থকে পাঠিয়ে ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে বসে রইলাম। সন্ধ্যা উৎরে গেল, স্বামী ফিরে এলেন অফিস থেকে তবু পার্থ এসে আমার সঙ্গে দেখা করল না। আমাকে একটু অন্যমনস্ক দেখে স্বামী বার দুই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে তোমার ?'
আমি বললাম, 'কিছু না।'
স্বামী আর জেরা করলেন না।

পরদিন সকালেই অবশ্য পার্থের খোঁজ মিলল। এসে আমার সঙ্গে আড়ালে দেখা করে বলল, 'বউদি বড অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করতে হবে।'
বললাম, 'টাকাটা দিয়ে আসতে পারনি এই তো ?'
পার্থ বলল, 'অমন অকর্মণ্য ভাববেন না আমাকে। দিয়ে ঠিকই এসেছি। তবে যেতে বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল। এক বন্ধু টেনে নিয়ে গেল তাদের ক্লাবে। সেখানে নূতন নাটকের রিহার্সাল। তাদের হাত এড়াতে এড়াতে বেশ রাত হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও আপনার সেই ফুলবাগানে গিয়েছিলাম বউদি। বাব্‌বা, কি বাগানই একখানা।'
আমি একটু হেসে বললাম, 'শ্যমলালদার সঙ্গে দেখা হল ? আলাপ করলে ?'

পার্থ মাথা নেড়ে বলল, 'না বউদি, রামলাল শ্যামলাল কারোরই পাত্তা মিলল না; সব নতুন ভাড়টে এসেছে। কেউ কারো খবর বলতে পারে না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। খোঁজ নিয়ে যাবই। বউদির কাছে নইলে মুখ থাকবে না। নিজেকে মনে করলাম এক গোয়েন্দা কাহিনীর ডিটেকটিভ, আসামীর পিছনে পিছনে এই রহস্যপুরীতে ঢুকে পড়েছি।'

বললাম, 'তারপর ?'

পার্থ তার বাহাদুরী দেখিয়ে বলতে লাগল, 'ঢুকে পড়া সহজ, বেড়োন তত সহজ নয় বউদি। বাগানে আলিগলির অন্ত নেই। তাছাড়া এখনো বেশ কিছু পশ্চিমা মুসলমান রয়ে গেছে। দু বছর আগে দেখলে গা ছম ছম করত। কিন্তু ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে আমি বুক ফুলিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালাম। যেন আমার পকেটে রিভলভার আছে। কিছু বললেই ধাঁ করে গুলী মেরে দেব। তাদের একজনের কাছ থেকেই শ্যামলালবাবুর হদিশ বের করলাম। এক মিঞা সাহেব বললেন, একটু এগিয়ে ডানহাতে যে ডিসপেনসারি আছে সেখানে গেলে শ্যামলালের খোঁজ মিলবে। ওখানকার ডাক্তারই নাকি চিকিৎসা করেছে। তারপর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'তুমি গিয়েছিলে সেই ডিসপেনসারিতে ?'

'গেলাম বই কি ? তারপর শুনুনই ব্যাপারটা।'

পার্থ সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল; ডিসপেনসারিতে গিয়ে সে কম্পাউণ্ডার ক্ষিতীশবাবুকে দেখতে পায়। তখন রোগীর বেশি ভিড ছিল না। ডাক্তারও বেরিয়ে গেছেন। ক্ষিতীশবাবু খাতায় কি সব লিখছিলেন। পার্থকে দেখে কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করলেন। পার্থ শ্যামলালের খোঁজ জানতে চাইল। ক্ষিতীশবাবু তখন বললেন, 'শ্যামলাল আছে তার শ্বশুরবাড়িতে।'

'শ্বশুরবাড়ি মানে ?'

'গুণ্ডামি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পরেছে। হাজতে আছে এখন, তার বউ বাসা তুলে দিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গেছে। আপনাকে পুলিসের লোক ভেবেই বস্তির কেউ তার কথা বলতে চায়নি।'

পার্থ প্রতিবাদ করে বলল, 'হতেই পারে না। আপনি নিশ্চয়ই আর কারো কথা বলছেন, আমার বউদির সঙ্গে ও ধরণের লোকের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না।'

তখন কম্পাউণ্ডার বললেন, 'কে আপনার বউদি ?'

পার্থ আস্তে আস্তে তখন সব পরিচয়ই আমার দিয়ে ফেলল। আমি যে শিক্ষিতা মহিলা, বড়লোকের ভাইঝি, উচ্চ শিক্ষিত নাম করা ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী, সগর্বে সবকথা সে জানাল। এমন কি ঠিকানা পর্যন্ত জানিয়ে এসেছে। কম্পাউণ্ডার হেসে বলেছে, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনার বউদি লতা দেবীকে আমি বেশ চিনি। চমৎকার মেয়ে। এপাড়াতেই তো ছিলেন। আমাদের সঙ্গে খুবই জানাশোনা। অমন মেয়ে আর হয় না। আমার নাম তাঁকে বলবেন।'

আমার সঙ্গে ক্ষিতীশবাবুর অত আলাপের কথা শুনে পার্থর খুব আনন্দ হল। সে আমার আর এক দফা প্রশংসা করল। ক্ষিতীশবাবু তাকে রেষ্টুরেণ্ট থেকে চা টোষ্ট আনিয়ে দিয়ে খুব আপ্যায়ন করলেন। পার্থ দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করায় তিনি বললেন, 'একটা ফোন করে দিন না এখান থেকে। ধারে কাছে কোন ফোন নেই আপনাদের?'

পার্থ হেসে বলল, 'আমাদের নিজেদের বাড়িতেই তো ফোন রয়েছে।'

পার্থ বাড়িতে ফোন করে দিল। ক্ষিতীশবাবু কিছুতেই চার্জটা নিলেন না। ভারি ভদ্রলোক।

শেষপর্যন্ত টাকাটা ক্ষিতীশবাবুর হাতেই দিয়ে এসেছে পার্থ। তিনিই শ্যামলালের স্ত্রীকে পৌঁছে দেবেন বলেছেন। ওদের ঠিকানা তিনি জানেন। বিদায় নেওয়ার সময় একথা বলেছেন, শ্যামলাল আসলে লোক খারাপ নয়। ছেলে মারা যাওয়ার পর মাথা খারাপের মত হয়েছিল। তাছাড়া টাকা পয়সার টনাটানি তো ছিলই তাই হয়তো অমন একটা গোঁয়াড়তুমি করে বসেছে। শাস্তি হলেও এমন কোন কঠিন শাস্তি তার হবে না। দশ পনের দিনের মধ্যেই হয়তো জরিমানা দিয়ে টিয়ে বেরিয়ে আসবে। তখন দেখা করবে আমার সঙ্গে। ক্ষিতীশবাবুই পাঠিয়ে দেবেন। তার জন্য যেন আমি কোন চিন্তা না করি। পার্থ তার বর্ণনা শেষ করে বলল, 'রীতিমত এক এ্যাডভেঞ্চার বউদি। কাল রাত এগার-টার সময় বাড়ী ফিরেছি।'

আমি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, 'ছিঃ পার্থ, তোমাকে না অত জোরে বলে দিলাম, আমার কথা কাউকে বলবে না, চুপচাপ শুধু টাকাটা দিয়ে চলে আসবে। আর তুমি ঠিক তার উল্টোটাই করে এলে।'

পার্থ বলল, "বাঃ ক্ষিতীশবাবু তো আপনাদের বন্ধু। তিনি সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন বলেই তো বললাম।'

আমি বলে উঠলাম, 'না জেনে শুনে তুমি আমার বহু অনিষ্ট করেছ পার্থ। জানিনে এর পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।'

পার্থ মুখ কালো করে বলল, 'বউদি, আমি বোকার মত অপরাধ করেছি। আমাকে মাপ করুন।'

আমি বললাম, 'যা হবার তা হয়েছে। এখন একটা কথা তোমাকে বলি। আমি যে তোমাকে টাকা দিয়ে ফুলবাগানে পাঠিয়েছিলাম, আর তোমার সঙ্গে যে ক্ষিতীশবাবুর আলাপ টালাপ হয়েছে তা তুমি কাউকে বলবে না। কাল সন্ধ্যার পর থেকে যা যা ঘটেছে তুমি তোমার মন থেকে একদম মুছে ফেলবে। বল, কথা রাখবে আমার?'

পার্থ বলল, 'রাখব বউদি। আমাকে মেরে ফেললেও আমার মুখ থেকে আর একটি কথাও কেউ বের করতে পারবে না।'

ও চলে গেল। কিন্তু তার আগে ছায়ার মত কে একজন সরে গেল যেন জানালার পাশ থেকে। আমি চিনতে পারলাম তিনি আমার শাশুড়ী। আমার সর্বদেহ শিউরে উঠল। উনি কি সব শুনতে পেলেন? কতটা শুনেছেন?

তারপর আরও কয়েকবার নানা কাজকর্মে তাঁর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। আমার মনে হতে লাগল, তিনি একটু বিশেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। যেন দৃষ্টির বল্লমে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কিছু একটা বিঁধে আনতে চাইছেন। সেই চোখ জোড়াকে আমি যত ভয় করতে লাগলাম তত এড়িয়ে যেতে চাইলাম, ততই আমার মনে হতে লাগল তা যেন নানাদিক থেকে আমাকে দেখছে আমি যেন চোখ বুজেও সেই দুটি চোখ দেখতে পেলাম। আমার ভয় হল আমি কি পাগল হয়ে যাব? রাঁচীর পাগলাগারদের বিকট মূর্তিগুলির কথা আমার মনে পড়ল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম ও দশা যেন আমার কোন দিন না হয়।

আমি সোজা চলে গেলাম আমার শাশুড়ীর কাছে। বললাম, 'মা আপনাকে একটা কথা বলব।'

তিনি বললেন, 'বল।'

আমি বললাম, 'শ্যামলালদাকে আমি দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

তিনি বললেন, 'বেশ করেছ। এবার যাওতো উনুনে কি যেন পুড়ছে, কড়াটা নামিয়ে রেখে এসো।'

আমি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে গেলাম। তরকারির কড়াটা নামিয়ে নিলাম উনুন থেকে।

ভেবেছিলাম আমার শাশুড়ী একটা একটা করে সব কথা জিজ্ঞেস করবেন আর আমি আস্তে আস্তে সব তাঁকে বলব অবশ্য একটু রেখে ঢেকে। কিন্তু তা হল না। তিনি কোন কথাই আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন না। শুধু বেশ করেছ বলে মুখ বন্ধ করে দিলেন।

রাত্রে স্বামীর পাশে শুয়ে একটু ভূমিকা করে বললাম, 'শোন একটা কথা তোমাকে বলবার আছে।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কি কথা বল তো?'

আমি বললাম, 'শ্যামলালকে আমি দশটা টাকা দিয়েছি।'

'তিনি আবার কে?'

আমি সংক্ষেপে কিন্তু বেশ একটু সতর্কভাবে তার পরিচয় দিলাম।

আমার স্বামী বললেন, 'বেশ তো। এমন ক্ষেত্রে তো দেওয়াই উচিত। তার জন্যে তুমি অত বড় ভনিতা করছিলে কেন? আমি ভাবলাম কতই না জানি একটা গুরুতর বিষয়।'

তাঁর মুখ থেকে একথা শোনবার পর আমার মন ভারি হালকা হয়ে গেল। যেন আমি আমার বিবেকের কাছে সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়ে গেছি ভাবলাম তাইতো আমি অত ভাবছিলাম কেন? শ্যামলালদাকে টাকা দেওয়াও দোষের হয়নি। আর সেই কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে পার্থের যদি আলাপ হয়েও থাকে তাতেও এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। আর ক্ষিতীশের কি এমন দায় পড়েছে যে এতদিন বাদে এতদূরে সে আবার খোঁজ নিতে আসবে? মিছেই আমি ভয়ে মরছি। আমি কি একা? আমার চারিদিকে কি লোকজন নেই? রক্ষাকর্তা হিসেবে আমার স্বামীই তো রয়েছেন আমার পাশে। আমার আর ভয় কিসের।

দিন দুই পরের কথা।

ভবানীপুরে আমার মামাশ্বশুররা থাকেন। সন্ধ্যাবেলায় আমার শ্বশুর

আর শাশুড়ী তাঁদের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। ফাঁকা বাড়ী পেয়ে আমার মনটা বেশ হালকা লাগতে লাগল। স্বামী অফিস থেকে ফিরে এলে আমি বললাম, 'এস আজ আমরা একটু তাস খেলি।'

স্বামী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তাস? একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে?'

আমি বললাম, 'মন্থরার মত আমার কি কুঁজ আছে নাকি পিঠে?'

রঞ্জনা কাছেই ছিল, সে ফোঁড়ন কেটে বলল, 'তাইতো দাদা, এ তোমার ভারি অন্যায়। বউদির মত রূপসী বউকে তুমি যদি মন্থরা বল তাহলে আমরা যাই কোথায়?'

স্বামী বললেন, 'কেন সুর্পনখার রোলটি তোকে দেওয়া যায়।'

'তাহলে নিজে যে দশানন রাবণ হয়ে পড়। আর বউদির নামটিও পাল্টে মন্দোদরী রাখতে হয়।'

আমি বললাম, 'যাক সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আজ আর শুনে কাজ নেই। খেলতে যদি চাও খেল।'

স্বামী বললেন, 'আজ হল কি তোমার? হঠাৎ এমন খুসির হাওয়া কিসের?'

রঞ্জনা বলল, 'বউদির মন বোঝা ভার। মুখখানা এই বর্ষার মেঘ আবার এই বসন্তের চাঁদ।'

আমি ওকে গোপনে একটা চিমটি কেটে বললাম, 'আচ্ছা ফাজিল হয়েছ তো! থাক থাক তোমায় আর কবিত্ব করতে হবে না।'

রঞ্জনা বলল, 'তাতো ঠিকই। আমার কবিত্ব তোমার কানে ভালো লাগবে কেন? কবিত্বের একচেটিয়া অধিকার শুধু দাদারই।'

কথার খেলা আর বেশী না বাড়িয়ে আমরা তাসের খেলার আয়োজন করলাম। কিন্তু তিনজনে তো খেলা হয় না। চতুর্থজনের দরকার। আমি আমার স্বামীকে দিয়ে পার্থকে ডেকে পাঠালাম। কিন্তু তার পাত্তা মিলল না। বোধহয় সে ফের তাদের নাটক রিহার্সেলে গেছে। অগত্যা আমরা তিনজনেই ব্রীজ খেলতে বসলাম। আমার স্বামী একা একপক্ষে আর আমরা ননদ ভাজে অন্যপক্ষে। খেলা বেশ জমে উঠেছে ইতিমধ্যে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল।

রঞ্জনা বলল, 'বাবা মা বোধহয় এসে পড়লেন।'

আমি বললাম, 'এত তাড়াতাড়িই ফিরবেন ওরা? মনে তো হয় না। তা'ছাড়া

বাবার কড়া নাড়ার ধরণ তো অমন নয়!'

আমাদের বাড়ির ঝিকে ডেকে বললাম, 'দরজাটা খুলে দিয়ে আয় তো যশোদা।'

একটু বাদে যশোদা ফিরে এসে বলল, 'বউদি, এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

আমি কোনরকমে বলতে পারলাম, 'আমার সঙ্গে?'

আমার স্বামী একটু কৌতুক করে বললেন, 'তুমি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লে। কেন তোমার সঙ্গে কোন ভদ্রলোক বুঝি দেখা করতে আসতে পারেন না?'

রঞ্জনা বলল, 'যাই বল। ভদ্রলোকের কোন রসবোধ নেই অসময়ে এসে আমাদের খেলাটা নষ্ট করে দিলেন।'

আমার স্বামী কৌতুকের ভঙ্গিতে বললেন, 'নতুন করে খেলা জমাতেও তো পারেন। আমাদের যে আসনটি শূন্য ছিল উনি হয়তো সেটা পূরণ করতে এসেছেন।'

রঞ্জনা বলল, 'ভদ্রলোক বসে আছেন, দেখাসাক্ষাৎটা আগে সেরে এসো বউদি।'

আমি আর আমার স্বামী দুজনেই নিচে নেমে এলাম। স্যুট পরা একজন ভদ্রলোক সোফার ওপর বেশ আয়েস করে বসেছিলেন, আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আর আমি তাকে দেখে আঁৎকে উঠলাম। না, কম্পাউণ্ডার ক্ষিতীশবাবু নয়, স্বয়ং নীলাম্বর রায়। দামী স্যুটে আগের চেয়ে স্মার্ট দেখাচ্ছে ওকে। আমি ওর সেই তীক্ষ্ণ ক্রূর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

নীলাম্বর মধুর হেসে বলল, 'চিনতে পারছ তো?'

আমি অস্ফুটস্বরে বললাম, 'চিনতে না পারার কি আছে?'

নীলাম্বর বলল, 'তোমাকে কিন্তু চেনা বেশ শক্ত। বিয়ের পরে মেয়েদের চেহারা এত বদলে যায়।'

তারপর আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি বোধহয় ভাবছেন এতরাত্রে এসে লোকটি কি হেঁয়ালী শুরু করল। লতা সম্পর্কে আমার মাসতুতো বোন। কিন্তু বড়লোকের স্ত্রী হয়ে ও বোধহয় সেই পুরোন সম্পর্ক স্বীকার করবে কি করবে না ঠিক করতে পারছে না।'

আমার স্বামী বললেন, 'আপনার অনুমান ঠিক নয়, আমি মোটেই

বড়লোক নই। বরং আপনাকেই—'

নীলাম্বর কথাটা শেষ করে বলল, 'বড়লোক বলে মনে হয়?' হেসে উঠল নীলাম্বর, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি মাথায় অন্তত তাই বটে।'

নীলাম্বরের স্পর্ধা আর অনর্গল মিথ্যা কথা বলবার চাতুর্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। স্বামীর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেলাম আমি।

তা লক্ষ্য করে নীলাম্বর বলল, 'লতা বালীগঞ্জের মেয়ে হলে কি হবে এখনও সেকেলে সংস্কার ছাড়তে পারেনি। আপনার নাম মুখে আনতে ওর সংকোচ হচ্ছে ফলে আমার নামটাও আপনার কাছে প্রকাশ পাচ্ছে না।'

আমার স্বামী বললেন, 'তাতে আর কি হয়েছে। এখন হোক দু-মিনিট পরে হোক নাম জানাজানি তো হবেই।'

নীলাম্বর হেসে বলল, 'ব্যক্তিটিকে জানাই বড় কথা। আমার নাম নীলাম্বর রায়।'

আমার স্বামী মৃদু হেসে নিজের নাম বললেন। তারপর নমস্কার বিনিময় করলেন ওঁরা।

এরপর দুজনে দুদিকের দুটি চেয়ারে বসল।

নীলাম্বর বলল, 'তুমি প্রথম দর্শনে অবাক হতে পার, কিন্তু একেবারে নির্বাক হয়ে থাকবার কোন কারণ নেই তো লতা।'

আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললাম, 'বাঃ নির্বাক হব কেন? কিন্তু তুমি আমাকে কথা বলবার সময় দিচ্ছ কই।'

নীলাম্বর আমার স্বামীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'লতা আমার দোষটা ঠিকই ধরেছে। আপনারও কি সেই অভিযোগ?'

আমার স্বামী একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'না, আমার কোন অভিযোগ নেই।'

তাঁর এই সামান্য একটু কথার মধ্যে যে নিন্দা যে তিরস্কার প্রকাশ পেল তা যেন আমার বুকের মধ্যে কেটে কেটে বসল।

চা নিয়ে আসবার ছলে আমি সেখান থেকে সরে গেলাম। যদিও মনের মধ্যে উদ্বেগ রইল, আমার স্বামীর কাছে নীলাম্বর কি বলবে, কতখানি বলবে! অবশ্য সেই সঙ্গে একথাটাও আমার মনে হল যে আমার সঙ্গে কথাবার্তা না বলে নীলাম্বর আগের সেই গোপন কথা প্রকাশ করবে না। কারণ তাতে আমার

ক্ষতি হতে পারে কিন্তু ওর কোন লাভ নেই।

একটু বাদে চা আর খাবার নিয়ে আমি ফের ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গে এল রঞ্জনা। ও যে এ ঘরে আসে আমার তা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রঞ্জনা নিজের গরজে নিজের কৌতূহলেই এল আমি বাধা দিতে পারলাম না। এল যখন পরিচয় করিয়ে দিতেই হয়। আমি মাসতুতো ভাইয়ের মিথ্যা সম্বন্ধের কথাটা উল্লেখ করলাম না, কিন্তু রঞ্জনা যে আমার ননদ সেই সত্য সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করলাম।

এই ছোট আচরণটুকু নীলাম্বর লক্ষ্য করল, আমার স্বামীরও তা দৃষ্টি এড়াল না।

নীলাম্বর রঞ্জনার দিকে চেয়ে বলল, 'বসুন।'

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'এত রাত্রে তোমাদের খোঁজ নিতে আসব এমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কাছেই আমার এক বন্ধু থাকে। তার সন্ধানেই এসেছিলাম। পেলাম না। ভাবলাম তোমাদের বাড়ির কড়া নেড়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি। সময়টা যদিও অভদ্র রকমের—'

আমি কিংবা আমার স্বামী কেউ কোন কথা বললাম না। তার আসাটা যে পছন্দ করি নি মৌন থেকে তা বুঝিয়ে দিলাম।

কিন্তু রঞ্জনা ফস করে বলে উঠল, 'আপনি অত সংকোচ করছেন কেন, রাত এমন কি আর বেশী হয়েছে?'

নীলাম্বর হেসে বলল, 'দেখুন, আপনার কথায় তবু একটু ভরসা পেলাম। লতার ভাবে দেখে মনে হচ্ছিল রাত এখন দুটোর কম নয়। এসে আমি ওদের আশ্রম পীড়া ঘটিয়েছি।'

আমার স্বামী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না, না। সে কি কথা।"

নীলাম্বর বলল, 'তা আমার একটু নিশাচর বৃত্তি অভ্যাস আছে। রাত্রে ঘুরে বেড়াতে আমার বেশ লাগে। রাত্রে শুধু শহরের চেহারাই বদলায় না, মানুষের রূপও আগাগোড়া বদলে যায়।'

শেষ কথাটা রঞ্জনাকে লক্ষ্য করেই বলল নীলাম্বর।

আমার মনে হল রূপ না বদলালেও রং বদলেছে রঞ্জনার।

এরপর নীলাম্বর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে অপরূপ সৌজন্যে বলল, 'এবার চলি, আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্রাম করছিলেন।

ব্যাঘাত করে গেলাম।'

রঞ্জনা বলল, 'বউদি সত্যি কথাটা বল না কেন ?'

আমি একটু 'চমকে উঠে বললাম, 'কোন সত্যিকথা ?'

রঞ্জনা বলল, 'আমরা তিনজনে মিলে তাস খেলছিলাম। আর মনে মনে প্রত্যেকেই আরো একজন কেউ এসে পড়ুক এই কামনা করছিলাম, এরই মধ্যে—।'

নীলাম্বর বলল 'আমার আবির্ভাব। তাই বলুন। আমি তাহলে ততখানি অবাঞ্ছিত অতিথি নই। আচ্ছা, আর একদিন এসে বরং আপনাদের তাসের আসরে বসা যাবে। আজ আর নয়। আজ উঠি।'

তারপর ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে কি একটা কথা যেন মনে পড়ে গেল নীলাম্বরের। তারপর দু পা ফিরে এসে বলল, 'লতা, ইয়ে—। তোমার সঙ্গে একটু—। আচ্ছা থাক থাক। সে না হয় আর একদিন হবে।'

ইঙ্গিত বুঝে আমার স্বামী আর রঞ্জনা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নীলাম্বর সেদিকে তাকাতে তাকাতে বলল 'ও কি আপনারা যাচ্ছেন কেন ? এমন কিছু গোপনীয় কথা নয় যে আপনার ঘরখানাকে একেবারে মরুভূমি করে দিয়ে যাবেন।'

কিন্তু ওরা দু'জনে দোতলায় উঠে যাবার পর নীলাম্বর আমার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ না ?'

আমার বুক কাঁপতে লাগল। তবু আমি খুব সাহস দেখিয়ে বললাম, 'অবাক হবার কিছু নেই, তুমি সব পার।'

নীলাম্বর বলল, 'আমার ক্ষমতায় তোমার অগাধ বিশ্বাস আছে দেখছি।'

আমি বললাম, 'তা আছে। কিন্তু এরাজ্যে পুলিসেরও অভাব নেই। তুমি কের আমার পিছু নিয়েছ কোন সাহসে ?'

নীলাম্বর ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'ছি ছি ছি তুমি এখন পরস্ত্রী। আমি কি তোমার পিছু নিতে পারি! কিন্তু পুলিসের ভয় দেখানো আমাকে বৃথা। একবার তো তাদের হাতে তুলে দিয়ে দেখলে কি রকম সিঙ্গি মাছের মত পিছলে বেরিয়ে এলাম। অমন অনেকবার এসেছি। কিন্তু এবার থানা পুলিশ করে তোমারও সুবিধে হবে না লতা। পুলিশ আমার হাতে শিকল দিতে পারবে। কিন্তু মুখতো শিকলে বাঁধা যায় না।'

আমার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল। আমি অস্ফুট স্বরে বললাম 'তুমি কি চাও?'
হঠাৎ বাইরে আমার শ্বশুরের গলা শুনলাম—'তোমার কি আক্কেল ড্রাইভার! গাড়ি দিয়ে একেবারে রাস্তা জুড়ে রেখেছ। নিজের বাড়িতে নিজে ঢুকতে পারব না! এতো মজা মন্দ নয়।'
হঠাৎ নীলাম্বর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, 'আমারই ড্রাইভারের এই কীর্তি। গাড়ি গেট্‌সে উধার রাখ।'

আমার শাশুড়ী আর শ্বশুর মশাই ড্রয়িংরুমের ভিতরে ঢুকলেন। আমার সঙ্গে অপরিচিত এক যুবককে কথা বলতে দেখে একটু বিস্মিতই হলেন। নীলাম্বর তাঁদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ত্রুটি আমারই, আমার ড্রাইভার আপনাদের পথ বন্ধ করেছিল।'
শ্বশুরমশাই আমার দিকে বিস্মিতভাবে তাকাতে আমি ওঁদের সঙ্গে নীলাম্বরের পরিচয় করিয়ে দিলাম। মাসতুতো ভাই এই বানানো কথাটিও বলতে হল। কারণ আমি না বললে নীলাম্বর বলত।
শ্বশুরমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। খুব খুসি হলাম। এতদিন তো পরিচয়ই ছিল না। আত্মীয়তা কুটুম্বিতা সবই আসা যাওয়ার ওপরে, হে হে হে।' সরলভাবে হাসলেন শ্বশুরমশাই। কিন্তু আমার শাশুড়ী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার আমার দিকে আর একবার নীলাম্বরের দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'লতা একটু শুনে যাও।'
আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি বললেন, 'ওরা কোথায়? স্ববু রঞ্জু ওরা কেউ বাড়িতে নেই?'
আমি বললাম, 'থাকবে না কেন মা? আপনার ছেলে তো একটু আগেও নিচের ঘরে ছিলেন। রঞ্জনাও ছিল।'
'হুঁ।'
বলে তিনি ওপরে উঠে গেলেন।
ফিরে এসে দেখি নীলাম্বর আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে দিব্যি গল্প জমিয়ে বসেছে। সেই শিকারের গল্প।
আমি যেতেই নীলাম্বর উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা আজ তাহলে যাই লতা। আর একদিন এসে কথাবার্তা বলব। মেসোমশাই কিন্তু চমৎকার মানুষ। উনি বলেছেন নিজের হাতে আমাকে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়ে দেবেন। সেই

লোভে আর একদিন আসতেই হবে।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'আসবেন বইকি, অবশ্যই আসবেন। আচ্ছা, এই রবিবার কি আপনার সময় হবে? দুপুরে কি সন্ধ্যায়, এক সঙ্গে বসে খেতে খেতে—'

নীলাম্বর একটু ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক এখনই তো বলতে পারছিনে মেসোমশাই। আমি আপনাকে পরে জানিয়ে দেব।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। পাশের ওই এডভোকেটের বাড়ি ফোন আছে। তুমি ইচ্ছে করলে ফোনেও খবর দিতে পার। এই দেখুন আবার তুমি বলে ফেললাম। বুড়ো হওয়ার এই দোষ। সম্বোধনটা ঠিক রাখা যায় না।'

নীলাম্বর হেসে বলল, 'ঠিকই বলেছেন মেসোমশাই। আপনি আমার পিতৃতুল্য। তুমি বলাই তো উচিত। আপনি বললেই বরং কানে লাগে।'

বিদায় নেওয়ার আগে নীলাম্বর আমার স্বামী আর ননদের সঙ্গেও দেখা করে গেল। ভদ্রতা করে বলল, 'খুব জ্বালিয়ে গেলাম যা হোক।'

সবাই একসঙ্গে আমরা খেতে বসলাম। খেতে খেতে নীলাম্বরের গল্পই বেশি হতে লাগল। আমি সে গল্পে যোগ দিলাম না। কারণ যোগ দেওয়ার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল এ আবার কোন উপগ্রহ এসে জুটল? কী মতলব ওর? কী ভাবেই বা আমি আত্মরক্ষা করব? এখনো কি আমার শ্বশুর শাশুড়ী আর স্বামীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বার সময় আসেনি। কিন্তু লুটিয়ে পড়ে সব কথা বললেই কি রক্ষা পাব?

রঞ্জনা বলল, 'কি বউদি, পাতের ভাত নড়ছে না যে?'

হঠাৎ শাশুড়ী বললেন, 'আচ্ছা লতা, তোমার এই মাসতুতো ভাইটির কথা এর আগে তো কোনদিন বলনি?'

আমি বললাম, 'একটু দূর সম্পর্কের—।'

'কিন্তু কথায় বার্তায় খুব দূরের বলে তো মনে হল না।'

রঞ্জনা বলল, 'মার কি বুদ্ধি! দূর সম্পর্কের লোকে বুঝি আর আপন হতে পারে না। আজকাল বন্ধুরাও আত্মীয়ের চেয়ে বড় হয় তা জানো।'

শাশুড়ী বললেন, 'তা অবশ্য হয়। আবার অনেক সময় বন্ধুকেও দাদা টাদা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এমন অনেক দেখেছি।'

আমার স্বামী হঠাৎ তাঁর মার দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও মা পরিষ্কার করে বল। তোমাদের সেই আগের আমল আর নেই আত্মীয় বল, বন্ধু বল, পুরুষের সঙ্গে আজকাল নানা ভাবে নানা কাজে মেয়েদের আলাপ পরিচয় হয়। বিয়ের পরেও সে বন্ধুত্ব থাকতে পারে। তাতে জাত যায় না।'

শাশুড়ী বললেন, 'আমি কি বলছি যায় ?'

স্বামী বললেন, 'তা বলনি। কিন্তু একথা মনে রেখো মা, লতা যাই হোক, সে এ বাড়ির বউ। তার বিন্দুমাত্র অসম্মানে শুধু আমার অসম্মান নয়, বাড়ীর সবাইয়ের অসম্মান! ওর চালচলনে তুমি যদি আপত্তির কিছু দেখ তুমি ওকে আড়ালে ডেকে বললেই পারো—।'

আমার শাশুড়ী হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলেন, 'ঢের হয়েছে বাবা। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তোমার বউয়ের সম্বন্ধে আমি যদি একটি কথাও বলি আমি বাপের বেটি নই।' খাওয়া শেষ না করেই সবায়ের আগে উঠে পড়লেন তিনি।

স্বামীর এই উদারতায় গর্বের চেয়ে নিজের মনে গ্লানিই বোধ করলাম বেশি। ছি ছি ছি আমি ওর যোগ্য নই! ভাবলাম আজ আর দেরি করব না। আজ রাত্রে ওঁকে সব কথা খুলে বলব। সব পাপ, সব অপরাধের জন্য আমি ওঁর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব।

কিন্তু কাজ কর্ম সেরে ঘরে গিয়ে দেখি স্বামী অফিসের ফাইল পত্র নিয়ে বসেছেন। আমি কাছে যেতেই বললেন, 'লতা, তুমি শোও গিয়ে। আমার কিছু এরিয়ার কাজ রয়েছে। শুতে দেরী হবে।'

বুঝতে পারলাম ওঁর মন চঞ্চল হয়েছে। তার কতটা নীলাম্বরকে দেখে কতটা মাকে রূঢ় কথা বলার জন্যে আন্দাজ করতে পারলাম না।

একটু চুপ করে থেকে আমি ফের তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হেসে বললাম 'মাকে অত কড়া কড়া কথা না বললেই পারতে। তুমি তো কোনদিন অমন বলনা।'

তিনি বললেন 'হুঁ।'

তিনি কিছুতেই ধরা দিতে চাইলেন না। তাঁর মনের অশান্তির কথাও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। শুধু বিছানায় শুয়ে ছট ফট করতে লাগলাম। তবে একথা আমার মনে হল ওঁকে সহজে কিছু বলা যাবে না। বাইরে যত

উদারতাই ওঁর থাকুক, নীলাম্বরকে দেখা মাত্রই যখন ওঁর মন এত চঞ্চল হয়ে উঠেছে আনুপূর্বিক সব কাহিনী শুনলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারবেন না। বিশ্বাস করে তিনি প্রতারিত হয়েছেন এই চিন্তা করা ওঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি হয়তো দুঃখে আমাকে কিছুই বলবেন না। বাড়ির আর পাঁচ জনের বিরূপতা, প্রতিকূলতা থেকেও তিনি আমাকে আগলে রাখবেন। কিন্তু সমস্ত গরল জ্বালা নিজের মধ্যে দিনরাত তিনি বয়ে নিয়ে বেড়াবেন। এই এক বছর ধরেই তো মানুষটিকে দেখ্‌ছি। ওঁর চাল চলন হাবভাব সব আমার জানা। উনি কথা বলেন কম ভাবেন বেশী! ওঁর একটুখানি শুধু বাইরে থেকে দেখা যায়। অনেকখানিই দেখা যায় না! ওঁর মত অমন চাপা স্বভাবের মানুষ আর আমি দুটি দেখিনি। তাই নিজের চেয়ে ওঁর জন্যেই আমার ভয় হল বেশি। যে মানুষ নিজে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যিনি এত রুচিবান, সরলতা আর শৌর্য যাঁর কাছে অভিন্ন, নারীর সঙ্গে কল্যাণী লক্ষ্মীর যিনি কোন পার্থক্য দেখতে পান না তেমন মানুষের কাছে আমি আমার সেই নোংরা জীবনকে কি করে উদ্‌ঘাটন করব? করলে তিনি কি তা সহ্য করতে পারবেন? যে স্ত্রী একবার তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে তাঁকে কি তিনি জীবনেও আর বিশ্বাস করতে পারবেন। ক্ষমা করতে পারবেন? পারবেন না, কিছুতেই পারবেন না। তাঁর বিশ্বাস আর ভালবাসা আমি জন্মের মত হারাব। তাই যদি হারাই তাহলে আর এই ঘর সংসার শাড়ি গয়না সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে আমার কি হবে? স্বামী, আমাকে ভালোবাসেন বলেই তো এগুলির এত মূল্য। যে দিন সেই ভালোবাসা যাবে সেদিন এইসব আসবাব-পত্রের দাম আমার কাছে কানা কড়ির সমানও থাকবে না। আমি মনে মনে স্থির করলাম ওঁকে কোন কথা বলা চলবে না ওর কাছ থেকে সবই লুকিয়ে রাখতে হবে। আমার রূপের মধ্যে যে পবিত্রতাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন তাঁকে তাই দেখতে দিতে হবে। তার জন্তে যদি অসাধ্য সাধন করাও দরকার হয় তা করা ছাড়া আমার উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে। বাগানের ফুলের মিষ্টি গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছে। আর আমার স্বামী আমার পাশে বসে রয়েছেন। আমি চমকে উঠে বললাম, 'ও কি তুমি এখনো শোওনি!

তিনি বললেন, 'এইবার শোব।'
'এতক্ষণ বসে বসে কি করছিলে?'
তিনি বললেন, 'দেখছিলাম।'
'কাকে?'
তিনি একটু হেসে বললেন, 'কাকে আবার। তোমাকে।'
আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'এতদিন ধরেই তো দেখছ, নতুন আবার কি দেখবার আছে।'
তিনি বললেন, 'চাঁদের আলোয় তোমার ঘুমন্ত মুখ এর আগে এমন করে আর দেখিনি। দেখে দেখে আমার মনে হল কি জানো? রূপ শুধু উন্মত্ত করে জ্বালা ধরিয়ে দেয় একথা মিথ্যে। রূপের মধ্যে যে healing power, soothing power আছে তা আর কোথাও নেই। দেখ আগের যুগের স্থপতিরা মন্দির গড়ে গেছেন। আজ আর মন্দিরের কাল নেই আজ আমাদের ভাগ্যে পড়েছে বাড়ি, ব্রীজ, বাঁধ। কিন্তু জানো লতা এগুলিও কম নয়। এদের মধ্যেও আনন্দ আছে সৌন্দর্য আছে।'

আমার স্বামী যেন তাঁর নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। এমন করে কথা বলতে তাঁকে আর শুনিনি। আমার মনে হল কিসের একটা আঘাত যেন তিনি পেয়েছেন। তাঁর আজকের সমস্ত কথাগুলি সেই বেদনার সুরে গাঁথা। তিনি তো নিজের মন খুলে দিয়েছেন। এবার আমার পালা। আমি খুলে দিতে পারলেই হয়। কিন্তু কিছুতেই পারলাম না, কত চেষ্টা করলাম তবুও না। আমার সমস্ত বেদনা কিসের ভয়ে কার অভিশাপে বুকের মধ্যে জমে বরফ হয়ে আছে। তা কিছুতেই গলবে না। কী করে গলবে? আমার চোখে তো জল নেই। আমার চোখে শুধু ভয়, আমার বুকের মধ্যে ভয় পাছে ধরা পড়ি।

কিন্তু আমার সেই শঙ্কাকে তখনকার মত আমার স্বামী দেখতে পেলেন না। তিনি নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন, 'একালের স্থপতি আমি। একটি মন্দির গড়বার ভার পেয়েছি। বলতো সে মন্দিরের নাম কি। এই ঘর বাড়ি বাগান? মোটেই তা নয়। সে মন্দির আমার নিজের জীবন। তাকে যদি আমি সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি তাহলেই আমার স্থাপত্যবিদ্যা সার্থক।' খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর ফের বলতে লাগলেন, 'জানো আমার জীবনেও প্রলোভন বড় কম আসেনি। যদি ধরা দিতাম অনেক

টাকা কড়ি হত, আমার ফার্ম অনেক বড় হয়ে যেত, কিন্তু আমি সেই বাঁকা পথে কিছুতেই পা বাড়াই নি। জানি আমার মন তাতে শান্তি পাবে না। এই শহরের অনেক ধনীর মেয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এসেছে। পণ যৌতুকের বহরের কথা শুনে মা বাবা এগিয়ে গেছেন কিন্তু আমার মন সায় দেয়নি। আমি বুঝতে পেরেছি তাদের সঙ্গে আমার রুচির মিল হবে না।'

আমি বললাম, 'এবার ঘুমোও। অনেক রাত হল।'

স্বামী তাঁর আগের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, 'কিন্তু বাইরের অর্থলোভ জয় করাটাই বড় বাহাদুরীর কথা নয়। নিজের মনকে যদি আমি শাসনে না রাখতে পারি তাকে যদি দ্বেষে বিদ্বেষে, সন্দেহে সংশয়ে নিত্য ভরে তুলি তাহলে জীবনের ভিতই যে আমার কাঁচা হয়ে থাকবে। তার ওপর শিক্ষা সংস্কৃতির সুপার-স্ট্রাকচারের কোন মানেই থাকবে না'

খানিক পরিচর্যার পর আমি স্বামীকে সেদিন ঘুম পাড়াতে পারলাম। ভোর ভোর সময় ফের আমার ঘুম ভাঙল। দেখলাম তিনি আমাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন। সত্যিই লতার মত আশ্রয় পেয়েছি তাঁর কাছে। ভারি ভালো লাগল তাঁর এই আদর। আশ্বাসে আমার বুক ভরে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তে একথাও মনে হল তাঁকে যদি সব কথা খুলে বলতাম, তিনি যদি জানতেন আমি কি ছিলাম, আর কি হীনভাবেই না আমি তাঁকে প্রতারণা করেছি তাহলে কি এত সহজে তিনি আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারতেন? জানি ওঁর মত উদার মানুষকে সন্দেহ করে আমি নিজেকেই ছোট করে ফেলছি। তবু আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারলাম না। যে মিথ্যার মায়াজালে আমি একবার নিজেকে জড়িয়েছি, হাজার চেষ্টা করলেও আমি তা ছিঁড়ে বেরোতে পারব না। এই বোধহয় আমার নিয়তি।

হঠাৎ ওঁর ঘুমন্ত মুখখানি ফের আমার চোখে পড়ল। নীলাম্বরের মত সুপুরুষ উনি নন। ওঁর নাক মুখের গড়নে খুঁৎ আছে। তা সত্ত্বেও আমার ভারি অপরূপ মনে হল ওঁর এই প্রেম। এ সম্পদ আমি কিছুতেই হারাতে পারব না। একে বজায় রাখতে হলে চিরজীবন যদি সত্য গোপন করে যেতে হয় আমি তাও করব!

পরদিন আমার স্বামীকে আরও প্রশান্ত আর প্রসন্ন মনে হল। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'কাল আমাকে ভূতে পেয়েছিল। খুব আবোল তাবোল বকেছি বুঝি?'

আমি বললাম, 'এমন ভুতে পাওয়া মাঝে মাঝে ভালো। তাতে মনের কথা অনেক বেরিয়ে পড়ে! সমস্ত কথাকে তুমি তো সিন্দুকে বন্ধ রেখেছ!'
তিনি তেমনি হেসে বললেন, 'আমি রেখেছি না তুমি?'
একথার জবাব আমার মুখে জোগাল না।
তিনি হঠাৎ অন্ত প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললেন, 'কদিন আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে।'
আমি বললাম, 'কেন?'
তিনি বললেন, 'টালীগঞ্জে একটা তেতলা ফ্লাট বাড়ির কনট্রাক্ট পেয়েছি। তাদের গরজ বড় বেশি।'

সেইদিন দুপুরে ওবাড়ি থেকে আমার ফোন এল। পার্থই খবর দিয়ে গেল এসে। আমি একবার ভাবলাম তাকে বলে পাঠাই আমি নেই বাড়ীতে, কি অন্ত কোন কাজে ব্যস্ত আছি। কিন্তু পার্থের সামনে মিথ্যে কথা বলতে বাধল। ছি ছি ছি, ও কি ভাববে?
গিয়ে ফোন ধরলাম। স্তব্ধ দুপুর। সে ঘরে আর কোন লোকজন নেই।
নীলাম্বর বলল, 'যাচাই করে নিচ্ছি। আমার নিমন্ত্রণটা পাকা আছে তো? না কি শ্বশুর স্বামীকে বলে সেটা নাকোচ করে দিয়েছ?'
বললাম, 'নাকোচ করব কেন? তুমি নিজেই তো বলে গেলে তোমার সময় হয়ে উঠবে না।'
নীলাম্বর বলল, 'তুমি বুঝি সেই ভরসাতেই আছ? তোমার শ্বশুরের সঙ্গে ভদ্রতা করেছিলাম। একটু দর বাড়াতে হয় তো। তাতে তোমার কাছে যে বাড়বে না তা আমি জানি। কিন্তু বাড়ুক কি না বাড়ুক আমি ঠিক গিয়ে হাজির হব। চব্য চোষ্যের ব্যবস্থা রেখো। আর সেই সঙ্গে ভোজন দক্ষিণা।'
আমি একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, 'ভোজন দক্ষিণা আবার কি?'
নীলাম্বরের হাসির শব্দ শোনা গেল, 'সেটাই তো আসল। আচ্ছা সে কথা যথাস্থানে কানে কানে বলব। এখন থাক'
নীলাম্বর আসবে শুনে শ্বশুরমশাই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বাইরের একজন লোক খাবে কিন্তু বাজার করলেন প্রচুর। হৈ-চৈ করলেন আরো বেশি। আমার শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সব কিছুরই একটা সীমা আছে। এমন কোন মহা কুটুম্ব তোমার আসছে যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছ?'

শ্বশুর মশাই বললেন, 'লতার আত্মীয় স্বজন তো এখানে বড় কেউ নেই। একজনের যদি বা খোঁজ মিলল তুমি অমন চটিতং হয়ে আছ কেন? আসলে নিজের বাপের বাড়ীর লোকজন ছাড়া আর কাউকে তুমি পছন্দ কর না।'
শাশুড়ী বললেন, 'কি করে বুঝলে?'
রঞ্জনা পিছন থেকে ফোড়ন কাটল, 'বাবা বোধহয় নিজেকে দিয়েই সত্যটা যাচাই করে নিয়েছেন।'
শাশুড়ী এবার হাসি চেপে বললেন, 'হতভাগা মেয়ের কথা শোন।'
শ্বশুরমশাইর আর একটা আর অসন্তোষের কারণ ঘটল। আমার স্বামী কুটুম্ব আপ্যায়ণের সময় উপস্থিত থাকতে পারলেন না। কোন এক জরুরি কাজে তাঁকে আজও বেরিয়ে পড়তে হল।
শ্বশুরমশাই রাগ করে বললেন, 'রবিবারেও ছুটি নেই? আজ আবার তোর কি কাজ পড়ল?'
স্বামী সংক্ষেপে বললেন, 'কাজ আছ।'
ব্যাপারটা আমারও ভালো লাগল না। বুঝতে পারলাম উনি নীলাম্বরকে এড়িয়ে যেতে চান। তার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলাও ওঁর ইচ্ছে নয়। হয়তো এরই মধ্যে তার মেকিত্ব আমার স্বামীর চোখে ধরা পড়েছে! তাই যদি পড়ে থাকে তিনি কেন স্পষ্ট করে সে কথা বললেন না? তাঁদেরই তো বাড়ি। কেন তিনি জোর করে বাধা দিলেন না? কেন বললেন না, 'লোকটিকে আমার সুবিধে মনে হচ্ছে না। ওকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দিতে রাজী নই।'
তাহলে তো আর এতকাণ্ড হত না। তাহলেও ঘটনা থেমে থাকত না। কিন্তু সে ঘটনা নিশ্চয়ই অন্য খাতে বইত।
দুপুরের আগেই নীলাম্বর এল। আজ আর সাহেবী পোশাকে আসেনি। দিব্যি ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসেছে। আজ আর কোন গাড়ি সঙ্গে দেখলাম না।
শ্বশুরমশাই তাকে দেখে বললেন, 'আরে এসো এসো। এত দেরি কেন?'
নীলাম্বর হেসে বলল, 'তাই নাকি? আমি আরো ভাবলাম বুঝি বেশি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি। আরো আগেই এসেছিলাম। নতুন কুটুম্ব না। জানি কি মনে করবেন তাই পার্কের বেঞ্চটাতে গিয়ে এই রোদের

মধ্যে খানিকক্ষণ বসে রইলাম।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক। এই রোদের মধ্যে—। ছিছি-ছি।'

নীলাম্বরের কথাবার্তার ভঙ্গি দেখে রঞ্জনাও মুখে আঁচল চেপে হাসতে লাগল। আমার মনে হল বাড়ির মধ্যে সেই মুগ্ধ হয়েছে সব চেয়ে বেশি।

নীলাম্বর তাকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'সুব্রত বাবু কোথায়? তাঁকে দেখছি নে যে।'

রঞ্জনা বলল, 'দাদার কি একটা জরুরি কাজ পড়েছে।'

নীলাম্বর বলল 'ও। তবু ভালো সেই সঙ্গে আপনার আর আপনার বউদিরও কোন জরুরি কাজ পড়ে যায়নি। তাহলে ফের আমাকে হোটেলে ছুটতে হত।'

রঞ্জনা বলল, 'তাহলেও তো বাড়িতে বাবা মা থাকতেন।'

নীলাম্বর মুখে অদ্ভুত এক নৈরাশ্যের ভঙ্গি এনে বলল, 'আর বাবা মা।'

রঞ্জনা হেসে উঠে বলল, 'দাঁড়ান বাবাকে বলে দিচ্ছি। যিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন তাঁকেই আপনি গ্রাহ্য করতে চান না।'

দু ঘণ্টার মধ্যে নীলাম্বর এ বাড়ীর এমন আপনজন হয়ে গেল যে আমি বিস্মিত হলাম। যেন সত্যিই সে কোন বিশেষ মতলব নিয়ে আসেনি। আমার শ্বশুর বাড়ীর প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই! ওর রসিকতায় আমার শাশুড়ী পর্যন্ত হাসতে বাধ্য হলেন। আর শ্বশুর তো ওর সঙ্গে এমনভাবে জমে গেলেন যেন কতদিনের আলাপ তার সঙ্গে। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে তাঁর জীবনের যা সর্বপ্রধান গৌরব সেই শিকারের নিদর্শনগুলি দেখাতে লাগলেন। নানা রকমের হরিণের শিং চিতাবাঘের চামড়া। কোথায় কোন জন্তুকে কি কৌশলে হত্যা করেছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ শুনতে শুনতে নীলাম্বর এক সময় বলে উঠল, 'আপনার বাহাদুরি তো কম নয়, মেশোমশাই শুধু হাত দিয়ে এতগুলি প্রাণী মেরে ফেললেন?'

শ্বশুরমশাই বিস্মিত হয়ে বললেন, 'শুধু হাত দিয়ে মানে?'

নীলাম্বর বলল, 'ও তবে বুঝি লাঠি সোটা ছিল?'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'লাঠি সোটা দিয়ে এসব মারা যায় না কি? তুমি

শুনেছ কোথায়ও ?'
নীলাম্বর বলল, 'তাহলে সেই অস্ত্রপাতিগুলিও বার করুন। তবে তো লোকের বিশ্বাস হবে ?'
শ্বশুর মশাই হেসে বললেন, 'তার মানে তুমি আমার বন্দুকটা না দেখা পর্যন্ত আমাকে শিকারী বলে বিশ্বাসই করতে পারছ না। আচ্ছা ছেলে তো।'
এর পর তিনি তাঁর রাইফেলটা বার করে দেখালেন তার গুণাগুণ ব্যবহার পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন।
ডুয়ার্সে থাকবার সময় কি ভাবে এর লাইসেন্স পেয়েছিলেন তার ইতিহাস বর্ণনা করলেন। সে গল্প আমরা অবশ্য অনেকবার ওঁর কাছে শুনেছি।
আমার শাশুড়ী এক সময় এসে তাড়া দিয়ে বললেন, 'শুধু কি গল্প করলেই চলবে ? খেতে টেতে হবে না ? দুপুর যে গড়িয়ে গেল।'

খাওয়া দাওয়ার পরও প্রায় সারাটা বিকেল নীলাম্বরকে আমার শশুরমশাই ধরে রাখলেন। পছন্দমত একটি শ্রোতা পেয়েছেন এতদিনে। কিন্তু তিনি শুধু তাকে গল্পই শোনালেন না। সারা বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন। কোথায় কোন ঘর, কে কোন ঘরে থাকে, ভবিষ্যতে যখন তেতলা তুলবেন, তখন নতুন কি ব্যবস্থা হবে, বাড়ির চেহারাটা কি রকম পালটাবে নীলাম্বরের কিছুই জানতে বাকি রইল না। দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে নীলাম্বর ফাঁকে ফাঁকে আড় চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগল। ওর সেই দৃষ্টি দেখেই আমি বুঝতে পারলাম এসব ওর ভান, অভিনয়, ওর আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা।
এক ফাঁকে আমাকে আড়ালে ডেকে উদ্দেশ্যটা আমাকে সে জানিয়েও গেল, 'চমৎকার শ্বশুরবাড়িটি জুটিয়েছ। আমাদের ভাগ্যে যে হোটেল সেই হোটেলই রয়ে গেল।'
বললাম, 'ইচ্ছা করলে তুমিও তো হোটেল ছেড়ে ঘর সংসার গড়ে তুলতে পার।'
নীলাম্বর বলল, 'উঁহু, সে আর এ কাঠামোয় হবে না। তাতে বড় ঝামেলা। সবাই তো আর তোমার মত রাতদিন অভিনয় করতে পারে না।'

চমকে উঠে বললাম, 'অভিনয়! একি বলছ তুমি?'
নীলাম্বর একটু হেসে বলল, 'ঠিকই বলছি। আমি এই কয়েক ঘণ্টাতেই হাঁফিয়ে উঠেছি। আর তুমি দিনের পর দিন রাতের পর রাত চালিয়ে যাচ্ছ, বাহাদুর মেয়ে বটে।'

রঞ্জনাকে দিয়ে শাশুড়ী আমাকে ডেকে পাঠালেন। কথাটা আর বেশিদূর এগোতে পারল না। কিন্তু ওর কথা বলার ধরণ শুনে আমার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল ওর সত্যিকারের অভিসন্ধিটা কি? সত্যিই কি চায় ও?

স্বামী ফিরে এলেন রাত্রে। তিনি একথা সেকথার পর হঠাৎ বললেন, 'শুনলুম নীলাম্বর বাবু নাকি বেশ জমিয়ে তুলেছিলেন?'
'কার কাছে শুনলে?'
স্বামী বললেন, 'সবাই বললে। মা, রঞ্জনা, বাবা। সবাই তো ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তুমিই শুধু কোন কথা বলছ না।'
আমি একটু হাসতে চেষ্টা করে বললাম, 'আমি, আমি আর নতুন কি বলব। খানিকক্ষন অপেক্ষা করলে তুমি তো নিজের চোখেই সব দেখতে পেতে।'
স্বামী বললেন, 'তোমার কি ধারণা আমি ইচ্ছা করলেই অপেক্ষা করতে পারতাম। আমার সত্যিই কোন জরুরি কাজ ছিল না?'
স্বামীকে ঠিক এই ধরণে এই ভঙ্গিতে এর আগে কথা বলতে শুনি নি। এই কি তবে শুরু? সব ব্যাপার জানতে পারলে উনি না জানি কি করবেন।

নীলাম্বর পরদিন আবার আমাকে ফোনে ডাকল।
আমার শাশুড়ী বললেন, 'বোধহয় সেই নীলাম্বর বাবুই ডাকছেন।'
আমি বললাম, 'কি জানি। কে ডাকছে তাঁর নাম পার্থ বলেনি। হয়তো অফিস থেকে উনিও ডাকতে পারেন।'
শাশুড়ী বললেন, 'সুবুর গলা পার্থ চেনে। তা হলে সে নিজেই বলে দিত। এ নিশ্চয়ই তোমার সেই মাসতুতো ভাই।'
তিনি সাধারণ ভাবেই কথাগুলি বললেন। কিন্তু ভিতরের চাপা ব্যঙ্গ গোপন রইল না। আমি মনে মনে অপমান বোধ করলাম। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। দোষ তো আমারই।

ফোন ধরতেই নীলাম্বর বলল, 'বাপরে। কোথায় গিয়েছিলে বলতো। মনে হয় যেন অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করে আছি।'

আমি বেশ একটু বিরক্তির সুরে বললাম, 'তুমি যখন তখন আমাকে এভাবে ফোনে ডেকে পাঠাও আমি তা পছন্দ করিনে। আমার বাড়ীর সবাইও অপছন্দ করেন।'

নীলাম্বর বলল, 'বাপরে এ যে দেখছি ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই। এ তো ঠিক শান্তশিষ্ট গৃহলক্ষ্মীর মেজাজ নয়। কিন্তু তুমি পছন্দ না করলে কি হবে, ফোনে কথা বলতে আমার ভারি ভালো লাগে। বিশেষ করে তোমাদের মেয়েদের গলা ফোনে যে কি চমৎকার শোনায় তুমি তা ধারণাও করতে পার না।'

আমি বললাম, 'বাজে কথা রাখ। তোমার কি কথা আছে তাই বলো'

নীলাম্বর বলল, 'কথাটা বড় গোপন। ফোনে বলা যায় না। এখানে লোক জন রয়েছে।'

বললাম, 'বেশ তো আমাদের বাড়িতে এসো না। বাড়ির সবাইর সঙ্গেই তো তোমার আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে।'

নীলাম্বর একটু হাসল, 'তা অবশ্য হয়েছে। কিন্তু নতুন কুটুম্ব হয়ে সেখানে কি ঘন ঘন যাওয়া ভালো দেখায়? তাছাড়া তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ আমাকে খুব স্নেহদৃষ্টিতে দেখেছেন বলে আমার মনে হয় না। অন্য কোন জায়গার নাম কর?'

আমি বললাম, 'আমি বাড়ি থেকে কোথাও বেরোই না।'

নীলাম্বর বলল, 'আহা তাতো জানি। তুমি এখন কুলাঙ্গনা হয়েছ। লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে পা দিতে মানা। বেশ সিনেমা, থিয়েটার, পার্ক, গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যে কোন জায়গার নাম করতে পার। সবই তোমার চেনা।'

কাতরভাবে বললাম, 'বিশ্বাস কর, আমি আজকাল কোথাও বেরোইনে। যাওয়ার মধ্যে শুধু মাসে দু একদিন ব্যাঙ্কে যাই।'

'ব্যাঙ্কে? কোন ব্যাঙ্কে?'

'আমাদের পাড়ার মধ্যে। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে যে ব্যাঙ্কটা।'

'তাই নাকি? ওখানে আমারও যাতায়াত আছে। বেশ ওখানেই এস। ভালোই হবে। কাছাকাছি হবে জায়গাটা।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি। সপ্তাহ খানেক বাদে—একদিন।'

নীলাম্বর বলল, 'বল কি অত দিন লাগবে ভাবতে? আমার যে এই মুহূর্তে দরকার।'

আমি বললাম, 'এই মুহূর্তে তো আর হয় না। বেশ, কাল দেড়টার সময় তুমি থেকো ওখানে। আমি যাব। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি আমি সময় দিতে পারব না। তোমার যা কথাবার্তা তার মধ্যেই শেষ করতে হবে।'

নীলাম্বর বলল, 'আমার কথা শেষ করতে এক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

আমি ফোন ছেড়ে দিলাম। নিজের বোকামির জন্যে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগলাম। ছি ছি ছি শয়তানের সঙ্গে ফের কেন চুক্তি করতে গেলাম। কিন্তু না করেই কি উপায় ছিল? দেখা করতে যদি রাজি না হতাম—নীলাম্বর ফোনের পর ফোন করত, সাড়া না পেলে চিঠি লিখত, জবাব না পেলে বাড়িতে এসে হানা দিত। এদিকে শাশুড়ী আর স্বামী যে ভাবে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন তাতে ওর সঙ্গে বেশি মেলামেশা আর না করাই ভালো। ও যা চায় তা চুকিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে একটা রফা করে নেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।

সারাদিন সারারাত আমার অস্বস্তির মধ্যে কাটল স্বামী আর শাশুড়ী বার বার আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। এক কথা জিজ্ঞেস করে আর এক কথার জবাব পেলেন। নিজের আচরণের এই অসঙ্গতি যত ধরা পড়ল তত আমার শুধু লজ্জা নয়, ভয়ও বেড়ে চলল।

পরদিন রান্না খাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ করে আমি শাশুড়ীকে বললাম, 'মা আমায় একটু ভল্টে যেতে হবে।'

তিনি বললেন, 'কেন?'

বললাম, 'নেকলেশ আর কানপাশাটা নিয়ে আসব।'

তিনি বললেন, 'কেন? হঠাৎ তোমার গয়না আনার দরকার কি পড়ল? কোথায় কোন নেমন্তন্ন টেমন্তন্ন আছে বলে তো জানিনে।'

বললাম, 'না, নেমন্তন্ন কোথাও নেই। এমনিই আপনার ছেলে সেদিন বলছিলেন গয়নাগুলি কি ব্যাঙ্কেই পড়ে থাকবে? মাঝে মাঝে এনে পরলেও

তো পায়। ব্যবহারের ওপর না থাকলে জিনিস খারাপ হয়ে যায়।'

তিনি একটু যেন কি ভাবলেন, তারপর সংক্ষেপে বললেন, 'যাও কিন্তু বেশি দেরি কোরো না।'

আমি বললাম, 'যাব আর আসব।'

শাড়িটা বদলে আমি একাই বেরোচ্ছিলাম হঠাৎ শাশুড়ী বললেন, 'একা যাচ্ছ কেন? রঞ্জনাকে নিয়ে যাও সঙ্গে।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আমি তো একাই যাই মা। গোল পার্ক থেকে দেশপ্রিয় পার্ক আর কত দূর।'

তিনি এবার আদেশের স্বরে বললেন, 'না। দিনকাল ভালো না। রঞ্জনা তোমার সঙ্গে যাক্।'

রঞ্জনা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল আমার শাশুড়ী তাকে ডেকে তুলে বললেন, 'কি কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস। ওঠ, যা তোর বউদির সঙ্গে।'

রঞ্জনা আপত্তি করে বলল, 'আমার আবার যাওয়ার কি দরকার?'

তিনি রূঢ় স্বরে বললেন, 'দরকার কি অদরকার তুই কি বুঝবি?'

শহরের মেয়ে। বালিগঞ্জ পাড়ায় থাকি। এর আগে কত একা একা এখানে সেখানে বেরিয়েছি। শাশুড়ী আপত্তি করেন নি। কিন্তু এখন তিনি আমার পায়ে বেড়ি দিতে চান, আজ তিনি আমাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। অথচ এখন পর্যন্ত কিছুই তিনি জানেন নি। যদি জানতে পারেন তাহলে কি এখানে ফের আর আমার স্থান হবে? কিছুতেই না। নালাম্বরের কাছ থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে। সে মুক্তির দাম যত বেশিই হোক না কেন।

রঞ্জনা আমার সঙ্গে খনিকটা পথ এসে বলল, 'বউদি, মার ব্যবহারের জন্ত আমাদের ভারি লজ্জা হয়। সেকেলে মানুষ কিনা, তুমি কিছু মনে কোরো না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

গড়িয়াহাটা মোড়ে এসে রঞ্জনা হঠাৎ বলল, 'বউদি ভালো কথা মনে পড়েছে। এখানে এই দুশো এক নম্বরে শিবানী বলে একটি মেয়ে থাকে, আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড। তার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে। তুমি তোমার কাজ সেরে আমাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে যেয়ো।'

আমি রঞ্জনার মনের ভাব বুঝতে পারলাম। ও নিজে আড়ালে থেকে

আমাকে আমার দরকারী কাজটা সারতে দিতে চায়। এই ছোট ননদের উপর আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। ও আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে। এরই মধ্যে বুঝতে শিখেছে প্রত্যেকের জীবনেই প্রাইভেসি বলে জিনিষ আছে। নানা ব্যক্তিগত সমস্যা আছে। তার সমাধানের সুযোগ দিতে হয়।

কিন্তু ওকে ছেড়ে দিয়েও আমার কেমন যেন একটু ভয় ভয় করতে লাগল। নীলাম্বরের মত মানুষের সঙ্গে একা একা দেখা করা কি ঠিক হবে? আবার ভাবলাম নির্জনে ছাড়া ওর সঙ্গে কথাও তো হবে না। আমার মুক্তির সর্ত পরিষ্কার করে জানতে পারব না। অথচ তা আমার অবিলম্বেই জানা চাই।

ব্যাঙ্কে এসে বেশ খানিকটা ভালো লাগল। রাত দুপুর নয়, দিন দুপুর। উজ্জ্বল রোদের আলো। লোকজনের আনাগোনা চলছে তার মধ্যে নীলাম্বর নেই দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। ও বোধহয় নিজেই ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেছে।

বাঁ দিকে বড় একখানি টেবিলে ভল্টের ইনচার্জ সুকুমার বাবু বসে আছেন। মাথায় একটু টাক, মাঝ বয়সী প্রসন্ন-মুখ ভদ্রলোক। আমি আমার স্বামী আর রঞ্জনা মাস ছয়েক আগে যেদিন প্রথম এই ভল্টে গয়না রাখতে আসি সেদিনই ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বেশ শান্তশিষ্ট, অমায়িক, ভালোমানুষ গোছের মানুষ। আমার স্বামী বলেছিলেন অমায়িক না হলে মেয়েদের সঙ্গে বাণিজ্য করা যায় না।

আরো কয়েকটি অপরিচিতা মহিলা সামনের চেয়ারগুলি জুড়ে বসেছিলেন। সুকুমার বাবু তাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রেখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'বসুন।'

আমি বসতে যাচ্ছি হঠাৎ পিছন থেকে মৃদু শব্দ শুনতে পেলাম, 'এই যে মিসেস চক্রবর্তি। আমার কয়েক মিনিট দেরী হয়ে গেল।'

ফিরে দেখি নীলাম্বর। ও ঠিকই এসেছে। পরনে নতুন স্যুট। ব্যাক ব্রাশ করা চুল। মুখে দৃঢ় প্রত্যয় আর সঙ্কল্প। দেখতে নীলাম্বর খুবই সুপুরুষ। আশে পাশে যারা ছিল তারা অনেকেই ওর দিকে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে যে চোখ ফিরিয়ে নিল তাও নয়। কিন্তু আর সবাইর চোখে তৃপ্তি হলে কি হয় ওকে দেখে আমার বুকের ভেতর কাঁপতে লাগল।

একবার ভাবলাম যাব না আর ওর সঙ্গে, কিন্তু পরমূহূর্তে মনস্থির করে

ফেললাম, আজ আমায় শেষ বোঝাপড়া করতেই হবে। যত ভয় পাব, যত দেরী করব তত বিভীষিকা এগিয়ে আসবে।

আমি ভল্টের ইনচার্জকে বললাম, 'একটু আসছি মিঃ গুপ্ত।'

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'নিশ্চয়। আপনার কাজ সেরে আসুন, ভল্ট পাঁচটা পর্যন্ত খোলা আছে।'

বাইরে এসে দেখি নীলাম্বরের সেই প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডমাষ্টার গাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে।

বললাম, 'খুব তো বড়লোক হয়েছ দেখছি, গাড়ি কিনলে কবে ?'

নীলাম্বর বলল, 'তোমার কাছে সত্য কথাটাই বলি। গাড়ি আমার কেনা নয়।'

"তবে কি চুরি করা।"

নীলাম্বর বলল, 'না অতখানি এখনো পেরে উঠিনি। ধার করে রেখেছি। তারপর দেখি কার কতখানি বুদ্ধির ধার, উত্তমর্ণের না অধমর্ণের।'

আমি বললাম, 'কি বলতে চাইছিলে বল, আমার বেশি সময় নেই।'

নীলাম্বর একবার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সময় আমারও বড় কম। কিন্তু এই ভীড়ের মধ্যে তো কথা-বার্তা হবে না। চল গাড়িতে করে একটা চক্কর দিতে দিতে কথাটা বলি।'

আমি বললাম, 'তুমি কি ভেবেছ তোমার সঙ্গে ফের আমি গাড়িতে উঠব ?'

নীলাম্বর হেসে বলল, 'ও, তুমি তো আজকাল জাতে উঠেছ। আচ্ছা ওই ফুটপাতের রেষ্টুরেণ্টটা পর্যন্ত চল অন্তত। তোমাকে তো বলছি কথাটা গোপনীয়। একটু আড়াল দরকার। অন্তত একটা পর্দা হলেও হবে।'

আমি মনে মনে ভাবলাম যার চোখের পর্দা নেই তারও কাপড়ের পর্দা না হলে চলে না।

ওর সেই গাড়িতে করেই পার হলাম রাস্তা। রেষ্টুরেণ্ট একেবারে নির্জন। দুটি বয় ঘুমোচ্ছিল। নীলাম্বরের হাঁক ডাকে উঠে দাঁড়াল। আমরা এসে বসলাম পর্দা ঘেরা ছোট কেবিনে। মাঝখানে দেড়হাত টেবিলের ব্যবধান।

আমি বললাম, 'খেতে আসিনি। তুমি কি বলবে বল।'

নীলাম্বর বেশি পীড়াপীড়ি করল না। শুধু দু কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

বললাম, 'কেন আমাকে ডেকেছ ?'

নীলাম্বর বলল, 'আশ্চর্য, তুমি আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি সুন্দর হয়েছ। তোমার সেদিনকার রূপের সঙ্গে এখনকার রূপের কোন তুলনাই হয় না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম. 'তোমার ওসব বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। তুমি একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছ। তা ভুলে যেয়ো না।'

মনে হল নীলাম্বরের মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। কিন্তু একটু বাদেই তার মুখ আর তার মুখের কথা তীব্র বিদ্রূপে ঝলসে উঠল, 'বটে! ভদ্রমহিলারা কথায় কথায় অত চটেন না। বোসো ঠাণ্ডা হয়ে বোসো। চায়ের বদলে কি সরবৎ দিতে বলব ?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'না না।'

নীলাম্বর বলল, 'তাহলে এবার কাজের কথাটা বলি। আমার কিছু টাকার দরকার।'

আমি বললাম, 'টাকা আমি কোথায় পাব ?'

নীলাম্বর একটু হাসল, 'তোমার এখন টাকার অভাব কি ? কাকা বড়লোক, শ্বশুর বড়লোক, স্বামী বড়লোক।'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'তাঁরা কেউ বড়লোক নন। কোনরকমে নিজেদের সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি বড়লোক হতেনও তোমাকে টাকা দিতেন না।'

নীলাম্বর বলল, 'তা ঠিক। তাঁদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তোমার সঙ্গে আছে, অন্তত ছিল। সেই সুবাদে তোমার কাছে কিছু ধার চাইছি।'

আমি বললাম, 'বিশ্বাস কর আমার কাছে কিছু নেই।'

নীলাম্বর বলল, 'বিশ্বাস করতে পারলাম না। শ্যামলালকে অত অনুগ্রহ করতে পার, আমি কি এতই অধম ? ছিঁটে-ফোটা করুণাও পেতে পারি না করুণাময়ী ?'

হেসে বললাম, 'শ্যামলালকে দশটাকা পাঠিয়েছিলাম। তা বোধহয় কম্পাউণ্ডারেরই পেটে গেছে! তুমি যদি চাও, দশটাকা দিতে পারি।'

নীলাম্বর বলল, 'আমার দরকারটা যদি এত প্রচণ্ড না হত তাহলে তোমার ওই নিজের ইচ্ছায় দেওয়া দশটি টাকা নিয়েই আমি খুশী হয়ে চলে যেতাম। কিন্তু আমার অভাব প্রকাণ্ড এক হাঁ বাড়িয়েছে। চারিদিকে দেনা, হোটেলের বিল বাকি। হাজার দশেক টাকা হলেই আমি মুক্ত হতে পারব। আমাকে মুক্তি দাও লতা।'

আমার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল। একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, 'অত টাকা কোথায় পাব! বিশ্বাস কর আমার সর্বস্ব বিক্রি করলেও অত টাকা হবে না।'

নীলাম্বর হেসে বলল, 'তোমার সর্বস্ব এখন একজনের কাছে বন্ধক রয়েছে। দান-বিক্রির সাধ্য আর তোমার নেই। তবে কেউ যদি কেড়ে নেয় সে কথা স্বতন্ত্র।'

আমি আর একবার উঠবার চেষ্টা করতে নীলাম্বর আমাকে ফের হাতের ইসারায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। তুমি আজকাল ঠাট্টাও বোঝ না। বেশ, একদিনে না পার, একমাস কি এক বছর বসে আস্তে আস্তে দিও।'

'কত? দশ হাজার টাকা?'

নীলাম্বর বলল, 'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'আশা করছি, তুমি এবারও আমার সঙ্গে ঠাট্টাই করছ।'

নীলাম্বর মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমার যারা পাওনাদার তারা বড় কাঠখোট্টা মানুষ। তারা টাকা পয়সার ব্যাপারে ঠাট্টা তামাসার ধার ধারে না। তাই এ বিষয়ে আমাকেও একটু সিরিয়াস হতে হয়। বেশ তুমি এক সঙ্গে না পার ক্রমে ক্রমে দাও। একমাস পরে কি এক বছর সময় নাও।'

হঠাৎ আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, 'না, আমি তোমাকে এক পয়সাও দিতে পারব না। কেন দেব?'

নীলাম্বর গলা নামিয়ে বলল, 'আস্তে। কেউ শুনে টুনে ফেলবে। দেবে আমার কাজের জন্যে আর তোমার নিজের উপকারের জন্যে। তুমি তোমার সংসারে শান্তিতে থাকতে চাও তো, সেই শান্তির জন্যে। নইলে ধর ওই কম্পাউণ্ডারই এসে মাঝে মাঝে তোমার খোঁজ নিয়ে যাবে। তারপর আমাদের সেই ক্লিনিকের খদ্দেররা, তোমার সেবা যাদের কাছে খুব আরামের ছিল, তারাও তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যাকুল হবে। চৌরঙ্গীর যে হোটেলে আমরা মাঝে মাঝে যেতাম, সেখানে বাবুর্চি খানসামা, চাকর-বাকরের অভাব ছিল না। সেই সঙ্গে আরও একটি লোক ছিল ক্যামেরা ম্যান। যুগল মূর্তি দেখলেই তার ফটো তোলার শখ হত। তোমার আমার ফটোও তার এ্যালবামে আছে। আমার তো মনে হয় ফটোগুলি তার কাছ থেকে উদ্ধার করে রাখা ভালো। নইলে তোমাদের স্বামী স্ত্রীর যুগল রূপের কাছে সেগুলি

বড় বিশ্রী দেখাবে।'

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। নীলাম্বর তাহলে এমনভাবে জাল ছড়িয়েছে? এত জঘন্য এত হীন হয়ে গেছে ওর স্বভাব?

আমি কাতর স্বরে বললাম, 'তুমি আমার এমন সর্বনাশ করবে? তুমি সত্যিই আমার পিছনে লেলিয়ে দেবে ওদের?'

নীলাম্বর বলল, 'তুমি যদি আমার সর্তে রাজী হও তাহলে কেউ কিছু খোঁজ পাবে না। আর আমার কাছ থেকে তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার শ্বশুরবাড়িতে যেমন কুটুম্বভাবে যাতায়াত করছি তেমনি করব। তোমার শ্বশুর তো আমার মাই ডিয়ার মেশোমশাই হয়েইছেন, তোমার স্বামীর সঙ্গেও দস্তি করতে আমার বেশিদিন লাগবে না। আর কালই শাড়ি সিঁদুর দিয়ে তোমার শাশুড়ীকে ধর্ম মা, ডাকব। আমার কাছ থেকে তোমার কোন ভয় নেই।'

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'না, তুমি আর ওমুখো যেতে পারবে না। আমার যা আছে সব নিয়ে তুমি আজই আমাকে নিষ্কৃতি দাও। কোন সংস্রব তুমি আমাদের সঙ্গে রাখো, আমি তা চাইনে।'

নীলাম্বর একটু হেসে বলল, 'এ তোমার আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নয়, নারী প্রকৃতিই এই। তারা বিয়ের আগে যাদের গলা জড়িয়ে ধরে, বিয়ের পরে তাদের গলা ধাক্কা দেয়। বেশ আমি রাজী আছি। কত টাকা দিতে পার তুমি?'

আমি বললাম, 'টাকা? টাকা আমি কোথায় পাব? নগদ টাকা আমার কাছে নেই!'

'তবে?

আমি বললাম, 'টাকা বাদ দিলে মেয়েদের আর কোন সম্পত্তি থাকে তা তুমি জানো না? গয়না আছে ভরি পনের। কাকা দিয়েছিলেন। সেগুলি আমারই।'

নীলাম্বর বলল. 'পনের ভরি গয়নার দাম আর কত? আচ্ছা তাই দাও। সই, তাই সই।'

বললাম, 'চল তাহলে।'

উঠে দাঁড়ালাম। আমার পা কাঁপতে লাগল। হাটতে গেলাম মনে হল আমার পা দুটো যেন মাটির মধ্যে বসে যাচ্ছে। অতিকষ্টে রাস্তা পার হয়ে ফের এসে

ব্যাঙ্কে পৌঁছলাম। সেখানে তেমনি রোদের আলো জ্বল জ্বল করছে।

ভোল্টের ইনচার্জ মিঃ গুপ্তের সামনে বসে আর দুটী সুন্দরী সজ্জিতা মহিলা নিশ্চিন্তে আলাপ করছে।

আমাকে দেখে মিঃ গুপ্ত তেমনি স্মিত মুখে বললেন, 'আসুন।'

আমি বললাম, 'এখন কি ভেতরে যেতে পারি?'

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

খাতায় সই করলাম। তিনি সই মিলিয়ে নিলেন। তারপর তিনি চাবির তোড়া নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন।'

আমার চাবিটি আমি সঙ্গেই এনেছিলাম। ভেবেছিলাম সত্যিই দু তিনখানা গয়না নিয়ে গিয়ে শাশুড়ীর কাছে নিজের সত্যবাদিতার প্রমাণ দেব।

নীলাম্বর হঠাৎ বলল, 'মিঃ গুপ্ত আপনাদের যখের পুরী দেখবার আমারও একটু শখ আছে।' মিঃ গুপ্ত একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বেশ তো চলুন।'

আমার একাউন্ট আমার স্বামী, আমি আর রঞ্জনাই শুধু অপারেট করতে পারব, এ ছাড়া আর কেউ তা ধরতে ছুঁতে পারবে না এই ছিল চুক্তি। কিন্তু মিঃ গুপ্ত শুধু আমার খাতিরেই নীলাম্বরকে সঙ্গে আসতে দিতে রাজী হলেন। তা ছাড়া এও ভাবলেন পরে নীলাম্বর একদিন তাঁদের কাষ্টমার হবেন। এ অঞ্চলে অল্পদিন হল ওই ভল্ট খোলা হয়েছে। পাবলিসিটির জন্তও সবাইকে দেখানো দরকার। প্রথম আমরা যেদিন এসেছিলাম, আমি, আমার স্বামী আর রঞ্জনা সেদিনও মিঃ গুপ্ত আমাদের সব ঘুরিয়ে টুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। সেই দিনটির কথা আজও আমার বার বার করে মনে পড়তে লাগল।

আণ্ডার গ্রাউণ্ড ভল্ট। বন্দুক হাতে হিন্দুস্থানি একজন দ্বারোয়ান ভল্টের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে সে সেলাম করল।

সিঁড়ির মুখে লিফ্ট। তাতে উঠে আমরা তিনজনে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। রঞ্জনার কথা মনে পড়ল। এই ওঠানামায় ওর ভারি আনন্দ ছিল। আমারও বেশ লাগত। কিন্তু আজ মনের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা।

ফ্লোরে লম্বা চেপটা অনেকগুলি চেষ্ট। তাদের গায়ে ছোট ছোট খোপ। আমার মনে হল আগের বারের চেয়ে চেষ্টের সংখ্যা আরো বেড়েছে। মিঃ গুপ্ত এগিয়ে এসে আমার সাতশ তের নম্বর চেম্বারে চাবি লাগালেন। তার পর আমি আমার চাবি ঘোরালাম। দুজনের চাবিতে খুলবে আবার দুজনের

চাবিতে বন্ধ হবে। এর পর নীলাম্বরকে নিয়ে মিঃ গুপ্ত অন্যদিকে সরে গেলেন। বললেন, 'আসুন আপনাকে মেকানিজমটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

আমি আমার ড্রয়ারটা টেনে বার করলাম। কাশ্মীরী চন্দন কাঠের বাক্সে আমার গয়নাগুলি থরে থরে সাজানো। শুধু আমার নয় আমার শাশুড়ী আর ননদেরও কিছু আছে আলাদা মোড়কে। সে মোড়ক সরিয়ে রেখে আমি আমার গয়নাগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম। চুড়ি. আংটি, আর্মলেট নেকলেস কাকা আমাকে বিয়ের সময় সব দিয়েছেন। তার স্নেহভরা মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখের জল কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল গয়নাগুলির ওপর। কিছুতেই চাপতে পারলাম না। একবার ভাবলাম কিছু গয়না রেখে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল নীলাম্বর পনের ভরি ওজন করে নেবে। তার এক রতি কম পেলেও ছাড়বে না। না পেলে বার বার এসে হানা দেবে আর বিরক্ত করবে। তার চেয়ে একেবারে সব দিয়ে দেওয়াই ভালো।

শাশুড়ী আর ননদের গয়নাগুলি বাদে আমার সব গয়না ছোট রঙীন থলিটির মধ্যে ভরে নিলাম। এই মনিপুরী সুন্দর থলিটি স্বামী আমাকে কিনে দিয়েছিলেন। আর ম্যারেজ এ্যানিভারসারির দিনে উপহার দিয়েছিলেন এই সরু হারছড়া। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা দেখতে লাগলাম।

হলের এক কোণে ছোট ছোট দুটি ড্রেসিংরুম। কি ভাবে আমি তার একটিতে ঢুকে পড়লাম। বড় আয়না সেট করা আছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি গহনা পরার ব্যবস্থা আছে। এর আগে দুদিন পড়েছিলাম। একদিন স্বামীর এক বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষে এই ব্যাঙ্ক থেকেই সালঙ্কারা হয়ে আমি তার সঙ্গে সোজা বিয়ে বাড়ীতে চলে গিয়েছিলাম। আর একদিন রঞ্জনা আর আমি এই রুমে দাঁড়িয়ে গয়না পরছিলাম। ওর গয়না আমাকে পরিয়েছিল, আমার সব গয়না দিয়ে আমি রঞ্জনাকে সাজিয়েছিলাম। রঞ্জনা দুষ্টুমি করে বলেছিল 'বউদি যদি এসব আর ফেরৎ না দিই?'

আজ আমি গয়নাগুলি একে একে ফের পরলাম। এইতো শেষ। আর তো কোনদিন পরব না। নিজের সালঙ্কারা মূর্তি একবার দেখলাম আয়নার মধ্যে। সত্যিই কি চমৎকার মানিয়েছে। বিয়ের আগে সব পরিয়ে দিয়ে কাকা আমার চিবুক ধরে আদর করে বলেছিলেন, 'আমার মা লক্ষ্মী।'

আর একদিন স্বামী বলেছিলেন, 'ঈস একেবারে মহারাণী সম্রাজ্ঞী। এর আগে

আমি সোনা গয়না দু চোখে দেখতে পারতাম না। স্কুল আর ভালগার লাগত। কিন্তু তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে।'
ড্রেসিংরুমের বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। বোধ হয় বেশী দেরি হয়ে যাচ্ছে। মিঃ গুপ্ত অধীর হয়ে উঠেছেন।
আমি তাড়াতাড়ি আমার গায়ের সব গয়না খুলে ফেলতে লাগলাম। সব খুললাম। একখানিও বাকি রাখলাম না। পনের ভরির চেয়ে অনেক বেশিই পাবে নীলাম্বর। পেয়ে আমাকে রেহাই দেবে।
থলিটি হাতে করে ড্রেসিংরুমের বাইরে এলাম। নীলাম্বর আর মিঃ গুপ্ত একটু দূরে অপেক্ষা করছেন হঠাৎ আমার মনে হল এই মুহূর্তে যদি মিঃ গুপ্তকে সব বলি, তাহলে কেমন হয়। যদি বলি আমার স্বামীকে খবর দিন, পুলিসকে খবর দিন এই সুইণ্ডলারকে এ্যারেষ্ট করুন। তাহলে আমার গয়নাগুলি বাঁচে। গয়নাগুলি বাঁচে কিন্তু জাত মান কি রক্ষা পায়? পুলিস কেস হলে নীলাম্বর সব বলে দেবে। ও তো দু কান কাটা, ওর তো আর লজ্জা ভয় বলে কিছু নেই। তাহলে সব বেরিয়ে পড়বে। কিছুই গোপন থাকবে না। তাতে আমার স্বামী শ্বশুরের মাথা হেঁট হয়ে যাবে। না অমন বোকামি আমি কিছুতেই করব না। যাক আমার গয়না, স্বামীর কাছে আশ্রয়টুকু থাকুক।

গেটের কাছে দারোয়ান জোর সেলাম জানাল। মিঃ গুপ্তের আড়ালে বকসিসের জন্য হাত বাড়াল। তা দেখে মৃদু হেসে নীলাম্বর একটি টাকা বের করে দিল। এর আগের দুবার আমার স্বামী দিয়েছিলেন।

লিফ্‌টে করে ওপরে উঠতে লাগলাম। কাগজে পড়েছিলাম লিফটে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। মাঝে মাঝে আটকে যায়। আমি কামনা করতে লাগলাম তেমন একটা ঘটুক। কিন্তু তা ঘটল না। নিরাপদে সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছলাম। খাতায় ফের নাম সই করতে হল। তারপর মিঃ গুপ্তের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। দরজা খুলে সেই প্রকাণ্ড গাড়িটার মধ্যে নীলাম্বর আমাকে তুলে নিল।
গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে ও চলল পশ্চিম মুখে।
আমি বললাম, 'ও কি, কোথায় যাচ্ছ? নাও গয়নাগুলি। নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।'

আমি থলিটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে।

নীলাম্বর পিছন ফিরে আমার দিকে তাকাল। ও আমাকে আগের মত ওর পাশের সিটেই বসাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি বসিনি।

নীলাম্বর একটু হেসে বলল, 'এটা ঠিক হস্তান্তরের জায়গা নয়। চল একটু নিরালায় যাওয়া যাক। সব সম্পর্ক আজই তো চুকে যাচ্ছে। গিঁট ছিঁড়তে হলেও তো একটু সময় লাগে।'

আমি বললাম, 'মোটেই সময় লাগে না। তুমি আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও। আমি বাসে ফিরে যাব। রঞ্জনা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, আমার শ্বশুর শাশুড়ী নিশ্চয়ই এতক্ষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সেই দেড়টায় বেরিয়েছি। আর এখন তিনটে বাজে।'

নীলাম্বর বলল, 'তোমার শ্বশুর বাড়িটি সত্যিই বড় ভালো লাগল লতা। বেশ একটি পরিপাটি সংসার। নেয়ে এসে পিঠের ওপর এলোচুল ছেড়ে দিয়ে তুমি যখন এঘর ওঘর করছিলে আমি আড়াল থেকে দেখছিলাম, ভারি চমৎকার লাগছিল। তোমার ঐ মূর্তি কোন দিন তো আর দেখিনি। আর তোমার ঘরগুলি কি সুন্দর করেই না সাজিয়েছ। জানালায় রঙিন পর্দা, দরজায় রঙিন পর্দা। তক তকে ঝকঝকে মেজে একটু ধূলো নেই কোথাও।'

সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে কথাগুলি নিজের মনেই যেন বলতে লাগল নীলাম্বর।

বলুক। এসব ওর অভিনয়। আমি ওর কথায় আর বিশ্বাস করিনে।

সে বলে চলল, 'কুলুঙ্গিতে হরগৌরীর মূর্তি। তার নিচে পিতলের ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ঝাড়। তোমার বেডরুমখানা সত্যিই বড় চমৎকার সাজিয়েছ। দেখতে দেখতে মনে হল এমন একখানা ঘর আমারও তো হতে পারত। আর হলে নিতান্ত মন্দ হত না।'

নীলাম্বর মুখ ফিরিয়ে ফের আমার দিকে তাকাল। মনে হল ওর গলায় অন্য সুর বাজছে। কিন্তু আমি তাতে কান দিলাম না। ওর কোন কথায় আমি আর বিশ্বাস করিনে।

গাড়ি ছুটে চলেছে। আমি শঙ্কিত হয়ে বললাম, 'একি তুমি কোথায় নিয়ে এলে আমাকে? এ যে আলীপুর ছাড়িয়ে এলে।'

নীলাম্বর বলল, ভয় নেই আমি তোমাকে ফের পৌঁছে দেব। এই রাস্তাটা

কি চমৎকার দেখ। দুদিকে রেইনট্রির সার। ছায়া ঢাকা এমন পথ কলকাতা শহরে খুব বেশি নেই।'

আমি বললাম, "তোমার প্রকৃতি বর্ণনা রাখ। এই নাও তোমার গয়না। তোমার কথা মত কাজ কর। আমার সব নিয়ে আমাকে রেহাই দাও। আমাকে এইখানেই নামিয়ে দাও আমি ঠিক চিনে যেতে পারব।'

নীলাম্বর বলল, 'যাবে বই কি। তোমার একটি মধুর গন্তব্য স্থান আছে কিন্তু আমার কিছুই নেই। তবু আমিও যাব, আমিও আজ সত্যিই কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি।'

ব্যাকুল হয়ে বললাম, 'তোমার যেখানে ইচ্ছা যাও। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।'

নীলাম্বর বলল, 'ছেড়ে তো দেবই। কেউ কি কাউকে জোর করে ধরে রাখতে পারে? তোমার ওপর সে জোর আমার আর নেই। একদিন ছিল।'

আবার আমার দিকে ফিরে তাকাল নীলাম্বর, 'আচ্ছা লতা, তুমি কি করে এই অসাধ্য সাধন করলে বলতো? তুমি কি করে এমন রূপান্তর নিলে, জন্মান্তর নিলে? আমি তো পারলাম না।'

নীলাম্বরের গলার আবেগ যত বাড়তে লাগল গাড়ীর বেগও চলল তত বেড়ে।'

আমি শঙ্কিত হয়ে বললাম, 'থাম, থাম, থাম, কোথায় যাচ্ছ? এই নাও গয়নার থলি আমাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।'

বলে ঝুপ করে থলিটা ওর কোলে ফেলে দিলাম, বললাম, 'এই নাও এই নাও।'

নীলাম্বর বলল, 'তুমি তোমার সব দিয়েছ। গায়ে একখানি গয়নাও রাখনি কেন লতা? আমি তো তা চাইনি। আমি তো তোমাকে নিরাভরণ করতে চাইনি। কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? মধু যখন পেলাম না শুধু পাপড়ি ছিঁড়লে কি হবে? চলো একটি বারের জন্যে আমার হোটেলে। সেখানে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটি একটি করে গয়নাগুলি ফের পরবে। তারপর চলে আসবে। ভয় নেই আমি তোমার গায়ে হাত দেব না, শুধু কয়েকটি মুহূর্ত চেয়ে দেখব, শুধু একটি মুহূর্তের জন্যে আমি তোমাকে আমার নিজের ঘরে পাব।'

আমি চিৎকার করে বললাম, 'বদমাস, লম্পট। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার মত? তুমি কি ভেবেছ গয়নাগুলির দাম আমার কাছে অতই বেশি?

আমি নেমে যাচ্ছি, এক্ষুনি নেমে যাচ্ছি।'
বলতে বলতে আমি গাড়ির দরজা খুলতে গেলাম।
নীলাম্বর গাড়ির স্পীড কমিয়ে গয়নার থলিটা আমাকে ফের দিতে দিতে বলল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ? থাম, থাম। আমাকে বিশ্বাস করো, এক মুহূর্তের জন্যে বিশ্বাস করো—'
আমি তীব্র চিৎকার করে বললাম 'না না না।'
আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট দৈত্যের মত একটা জিনিস আমাদের গাড়ির ওপর এসে পড়ল। আমার কথা থেমে গেল সামনের দৃশ্যপট মুছে গেল আমি আর কিছুই টের পেলাম না।

জ্ঞান হল দুদিন পরে। এই হাসপাতালে। সর্বাঙ্গে বন্ধন। হাত নাড়তে পারিনে, পা নাড়তে পারিনে, পাশ ফিরতে পারিনে। ওরা আমাকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। ওরা কি ভাবছে আমি পালিয়ে যাব?

নার্স এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কোথায়?' সে বলল, 'পি-জি হাসপাতালের কেবিনে আপনি আছেন। কেমন বোধ করছেন এখন?'
আমি বললাম, 'ভাল না। বড় যন্ত্রণা।'
নার্স হেসে আশ্বাস দিল, 'কমে যাবে। আস্তে আস্তে সব কমে যাবে। আপনি অনেক ভাল হয়ে গেছেন। আপনার স্বামী এতক্ষণ তো এখানেই ছিলেন। তাঁকে ডেকে দেব?'
আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না থাক।'
নার্সটিকে কিশোরীর মত দেখতে। ভারি মিষ্টি চেহারা। হাসিটি আরো মিষ্টি। হেসে বলল, 'কেন অত লজ্জা কিসের?'
এবার আমার সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে মনে পড়ছে। নার্স কি করে বুঝবে কিসের লজ্জা। আমার কি আর ওঁর সামনে মুখ দেখাবার জো আছে?'
নার্স বোধহয় আমার স্বামীকে ডাকতে যাচ্ছিল আমি তাকে হাতের ইসারায় আরো কাছে ডাকলাম তারপর ফিস ফিস করে বললাম, 'আমার সঙ্গে যে ছিল—।'
নার্স এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর একবার ঢোক গিলে বলল, 'ইয়ে মানে—তিনি ভালোই আছেন। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর সব শুনবেন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।'
বুঝতে পারলাম। তার জন্য চিন্তার আর কোন কারণ নেই।

একটু পরে সত্যিই আমার স্বামী এসে দাঁড়ালেন। আহা, যুগ যুগান্তর পরে তার মুখখানি দেখলাম। সে মুখে শাসন নেই, ভ্রূকুটি নেই। সে মুখ করুণায় কোমল কান্ত কমনীয়। এ কেমন করে সম্ভব হল?

তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন,, 'কেমন আছ লতা ?
তাঁর সেই স্পর্শে, তাঁর সেই কথায় আমার বুকের ভিতরের কান্নার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম, 'তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে ? তুমি কি আমাকে ঘৃণা করবে না ?'
নার্স তাড়াতাড়ি ছুটে এল। আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের সুরে বলল, 'মিঃ চক্রবর্তী, পেশেণ্টের অবস্থা আপনি তো জানেন। দয়া করে আপনি এবার একটু বাইরে যান।'
নার্সের তিরস্কারে আমার স্বামী তেমন লজ্জিত হলেন না। ঘর থেকে চলে যাওয়ার আগে আমার আরো কাছে এসে বললেন, 'তুমি কোন চিন্তা কোরো না। আমি সব খোঁজ নিয়েছি। পুলিস আমাকে সব বলেছে। **He was a wretch, he was scoundrel.**
আমার স্বামীর কথাগুলি তীব্র ঘৃণায় ভরে উঠল। তিনি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন।

আমি চোখ বুজলাম। ভয়ে আর ক্লান্তিতে। হঠাৎ আমার মনে হল, সে ওই সবই ছিল, কিন্তু সে আর নেই। পুলিস তাকে জানত। কিন্তু সব কথাই কি জানতে পেরেছিল ?

এবার আমার জানাবার পালা এসেছে। পুলিস আমার কাছেও অনেক কথা জানতে চাইবে। আমি একটু সুস্থ হয়েছি দেখলেই তারা এসে হানা দেবে। তারা সব নাড়ীনক্ষত্র খুঁজে বার করবে, কোন মানা শুনবে না। তাদের কাছে জবানবন্দী দেওয়ার আগে আমি স্বামীর কাছে সব বলব। একদিনে না পারি অনেক দিনে আস্তে আস্তে বলব।
কিন্তু বললেই কি তিনি সব বিশ্বাস করবেন ? আজ আমার অসুস্থ দশা দেখে তাঁর মনে দয়া হয়েছে। কিন্তু যখন সেরে উঠব, সমাজের মধ্যে সংসারের মধ্যে যখন ফিরে যাব তখনও কি তাঁর মনে মমতা থাকবে, ভালবাসা থাকবে ? আমি যে গয়নাগাটি নিয়ে নীলাম্বরের সঙ্গে ইচ্ছা করে পালাচ্ছিলাম না একথা কি তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করবেন ?

বিশ্বাস কর বিশ্বাস কর বলতে বলতে এক পাপী তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। আর এক পাপীয়সী বেঁচে রইল। নিমেষে নিমেষে সে ওই একই কথা বলবে, 'বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, আমার সব কথা অবিশ্বাস করো না।'

সমাপ্ত